দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

নরেন্দ্র মোদীই
ভারতবর্ষের শেষ
আশা-ভরসা
পৃঃ ১১

নিবেদিতার কালীসাধনা
ভারতীয় ঐতিহ্য ও
পৌরুষের সাধনা
—পৃঃ ২৩

৭১ বর্ষ, ৮ সংখ্যা।। ৫ নভেম্বর ২০১৮।। ১৮ কার্তিক - ১৪২৫।। যুগাব্দ ৫১২০।। দীপাবলী সংখ্যা।। website : www.eswastika.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

দীপাবলী বিশেষ সংখ্যা

৭১ বর্ষ ৮ সংখ্যা, ১৮ কার্তিক, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ

৫ নভেম্বর - ২০১৮, যুগাব্দ - ৫১২০,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2016-18

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক রণেন্দ্রলাল ব্যানার্জী কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

শবরীমালা ও তিন তালাককে আদালত একভাবে দেখতে পারে না ▯ জয় পণ্ডা ▯ ৭

নরেন্দ্র মোদীই ভারতবর্ষের শেষ আশা-ভরসা ▯ রবীন্দ্রনাথ দাস ▯ ১১

রাজ্যের নাম বদল নিয়ে রাজ্য সরকারের ঘ্যানঘ্যানানি ▯ বিনয়ভূষণ দাশ ▯ ১৪

দক্ষিণা কালীমূর্তির রূপকার সাধক কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ ▯ অরুণ মুখোপাধ্যায় ▯ ১৯

অগ্নিযুগে বঙ্গদেশের কালী আরাধনা ▯ রবিরঞ্জন সেন ▯ ২১

নিবেদিতার কালীসাধনা ভারতীয় ঐতিহ্য ও পৌরুষের সাধনা ▯ পুলকনারায়ণ ধর ▯ ২৩

কালের দেবতা কালী ▯ অমিত ঘোষ দস্তিদার ▯ ২৭

যশোমাধব ও ঢাকেশ্বরী ▯ জলজ বন্দ্যোপাধ্যায় ▯ ৩১

বৌবাজার হালদার বাড়ির ঐতিহ্যময় কালীপুজো ▯ সপ্তর্ষি ঘোষ ▯ ৩২

গল্প : মার্ডারার ▯ সন্দীপ চক্রবর্তী ▯ ৩৫

একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্য 'স্ব-উৎসারিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে : মোহন ভাগবত ▯ ৪৩

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৭-১৮ ▯ **সমাবেশ-সমাচার : ২৮-৩০** ▯ **নবাঙ্কুর : ৪০-৪১** ▯ **সাপ্তাহিক রাশিফল : ৫০**

প্রকাশিত হবে
১২ নভেম্বর,
২০১৮

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
১২ নভেম্বর,
২০১৮

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

বিতর্কে শবরীমালা

'ঋতুমতী মহিলারা কি অস্পৃশ্য? যদি তা না হন তাহলে কেন কেরলের শবরীমালা মন্দিরে তারা ঢুকতে পারবেন না? ভক্ত হয়েও কেন দিতে পারবেন না পুজো?' সুপ্রিম কোর্ট এভাবেই তার রায়ে শবরীমালা মন্দিরে দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত এই নিয়মটিকে বৈষম্যমূলক বলে ঘোষণা করেছে। তারপরই শুরু হয়েছে বিতর্ক। আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন কেরলেরই মহিলারা। প্রশ্ন উঠেছে, এত বড়ো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে তাদের সঙ্গে কথা বলা হলো না কেন? হিন্দু মঠ-মন্দিরের ক্ষেত্রেই কেন বারবার আদালত হস্তক্ষেপ করে? দেশের বহু মসজিদে মুসলমান মহিলাদের প্রবেশাধিকার নেই। কিন্তু আদালত সে ব্যাপারে নীরব। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যার বিষয় শবরীমালা বিতর্ক। শবরীমালার ঐতিহ্য ও আধুনিক সময়ে তার প্রাসঙ্গিকতা বিষয়ে লিখবেন এই সময়ের বিশিষ্ট লেখকেরা।

।। দাম একই থাকছে— দশ টাকা মাত্র।।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন। তবে ইউ বি আই-এর শাখা থেকে পাঠালে কোনো ব্যাঙ্ক চার্জ লাগবে না।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : SWASTIKA
A/C. No. : 0314050014429
IFSC Code : UTBI0BIS158
Bank Name :
United Bank of India
Branch : Bidhan Sarani

সানরাইজ®

শাহী গরম মশলা

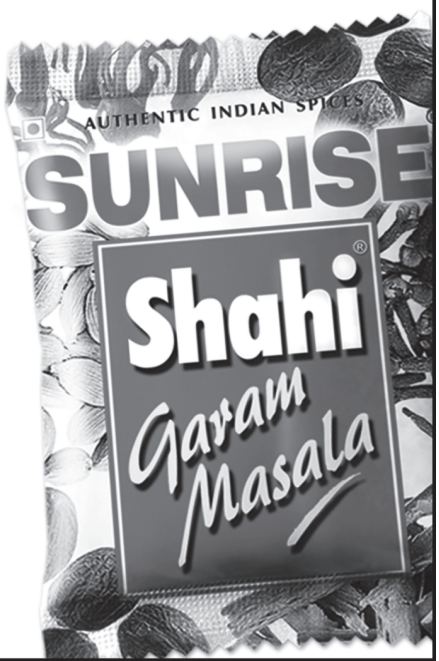

SUNRISE PURE

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

সম্পাদকীয়

ভয়ংকরের আরাধনা করিব

স্বামী বিবেকানন্দ এবং ভগিনী নিবেদিতা—দুইজনেই কালীরূপের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যটির ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। সৃষ্টি এবং প্রলয়—এই দুয়ের সমন্বয়েই যে কালী—যিনি কালকে ধারণ করেন—এমনই অনুভব হইয়াছিল স্বামীজী এবং নিবেদিতার। স্বামীজী তাঁহার 'কালী দ্য মাদার' কবিতায় এবং নিবেদিতা তাঁহার কালী বিষয়ক গ্রন্থে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধিকারিণী এই জগন্মাতার ভয়ংকরী রূপটির বর্ণনা করিয়াছেন। আবার সেই ভয়ংকরের ভিতরেই যে লুক্কায়িত রহিয়াছে সন্তানের প্রতি মায়ের বরাভয়দাত্রী অভয়মূর্তিটি—তাহারও সন্ধান পাইয়াছিলেন স্বামীজী এবং নিবেদিতা। দুইজনেই শক্তির আধার হিসাবে কালী বন্দনা করিয়াছেন। আকাশে বৈশাখী মেঘের ঘনঘটা দেখিয়া নিবেদিতা তাহাতেও কালীরূপ দর্শন করিতেন। তন্ময় হইয়া বলিতেন—'কালী...কালী।' প্রলয় এবং সৃষ্টির সমন্বয়ে কালী রূপটির বন্দনা করিয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন—'ডান হাতে তোর খড়্গ জ্বলে/ বাঁ হাত করে শঙ্কাহরণ/ দুই নয়নে স্নেহের হাসি/ ললাট নেত্র অগ্নিবরণ।'

কালী শক্তিরূপিণী। কালী জননীরূপিণী। আবার কখনও কালী কন্যারূপিণীও বটে। ভারতের দুই শ্রেষ্ঠ সাধক পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণদেব এবং রামপ্রসাদ সেন—উভয়েই কালীকে কল্পনা করিয়াছেন কন্যা রূপে। রানি রাসমণি প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণ শিশুর সারল্যে কালী আরাধনা করিয়াছেন। হালিশহরে রামপ্রসাদ সেনের কাছে কালী আবির্ভূতা হইয়াছিলেন কন্যারূপে। রামপ্রসাদ গান বাঁধিয়াছিলেন—'কালী নামে দাও রে বেড়া, ফসলে তছরুপ হবে না।' নদীয়ার কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ এক অন্ত্যজ শ্রেণীর গৃহবধূর মধ্যেই প্রথম কালীরূপ কল্পনা করেন। কৃষ্ণানন্দ কল্পিত সেই কালী প্রতিমাই এখন পূজিতা হন বঙ্গদেশের সর্বত্র। আবার বিপ্লবী সূর্য সেন, তাঁহার সহযোগী বিপ্লবীগণ এবং অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের জীবনীপাঠে ও স্মৃতিচারণায় জানা যায় যে, কালীমূর্তির সামনে নিজ শরীরের রক্ত অর্পণ করিয়া তাঁহারা বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষা লইতেন।

আমাদের কাছে কালী সর্ববিধ রূপেই বারেবারে ধরা দিয়াছেন। তিনি শক্তি দিয়াছেন আমাদের। তিনি জননীর স্নেহে বরাভয় দিয়াছেন। আবার তিনিই কন্যারূপে আমাদের গৃহে ক্রীড়া করিয়াছেন। এই মহাকালের ভিতর, এই ব্রহ্মাণ্ডের ভিতর আমরা সর্বত্রই কালী দর্শন করিয়াছি। শাস্ত্রজ্ঞগণ কহেন—মহাকাশের এই যে গভীর কালো রূপ, এই যে অন্ধকার—ইহাই কালী কল্পনা। এই অসীম ব্রহ্মাণ্ডের মাঝে ক্ষুদ্র এই পৃথিবীকে ধারণ করিয়া যিনি নিরন্তর লীলা করিতেছেন, তিনিই কালী।

দীপাবলির রাত্রে আলোর উৎসবের ভিতর দিয়া এই কালীমাতারই আরাধনা করিব আমরা। তাঁহার কাছে শক্তি চাহিব, তাঁহার কাছে সৃষ্টিও চাহিব। অন্ধকার বিনাশ করিয়া, অশুভকে পরাজিত করিয়া, বরাভয়দাত্রী রপে তিনি আবির্ভূতা হইবেন—ইহাই আমাদের প্রার্থনা। স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায়—আমরা ভয়ংকরের আরাধনা করিব। ভয়কে জয় করিবার জন্য।

সুভাষিতম্

অকর্তব্যং ন কর্তব্যং প্রাণৈঃ কণ্ঠাগতৈরপি।
অকর্তব্যমেব কর্তব্যং প্রাণৈঃ কণ্ঠাগতৈরপি।। (চাণক্যনীতি)

প্রাণ কণ্ঠাগত হলেও কখনো অকর্তব্য কাজ করা উচিত নয়। আর প্রাণ কণ্ঠাগত হলেও কখনো কর্তব্য থেকে বিরত হওয়া উচিত নয়।

শারদীয়ার শুভ মুহূর্তে সকলকে জানাই প্রীতি,
শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন—

With Best Compliments from :

C. S. TEXTILES
PVT. LTD.

With Best Compliments from :

A Well Wisher

(A.T.)

With Best Compliments from :

Sampat Kumar Mandhana

With Best Compliments from :

S. S. GARMENTS

Office & Godown

305, Jessore Road, Kolkata - 700048
Phone : 25226637/1339, M : 9830493575, Fax : (033) 22217899

শবরীমালা ও তিন তালাককে আদালত একভাবে দেখতে পারে না

অতিথি কলম

জয় পণ্ডা

শবরীমালা মন্দিরে মেয়েদের প্রবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হোক এমনটা ভারতবর্ষের বহু মানুষই চান। তবে একই সঙ্গে তাঁরা এটাও চান এই পরিবর্তন আসুক ধর্মীয় সংস্কারের মাধ্যমে, আলাদলতের নির্দেশের ভিত্তিতে নয়। ভক্তদেরই এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া উচিত। অনেকেই এমন মনে করছেন শবরীমালা নিয়ে আদালতের সাম্প্রতিক রায়ের ফলে ধর্মনিরপেক্ষতারই প্রসার হলো, আসলে ঘটল উল্টোটাই।

তাহলে, সরকার বা তার পরিচালনার মাধ্যমগুলি, যেমন আইনসভা বা আদালত ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপের ওপর কখনই হস্তক্ষেপ করতে পারে না। সেক্ষেত্রে সতীপ্রথা বিলোপ, জাতিভেদ প্রথার অবলুপ্তি বা অতি সাম্প্রতিক তাৎক্ষণিক তিন তালাককে বেআইনি ঘোষণা কিন্তু আদালতই করেছে। অর্থাৎ এই ক্ষেত্রগুলিতে প্রশাসন হস্তক্ষেপ করেছে। আমার মতে তা সবই ন্যায়সঙ্গত। তাহলে শবরীমালার সঙ্গে এগুলির তফাত কী? তফাত অনেক।

এই ভিন্নতাগুলির আলোচনার আগে একটা কথা বলে নেওয়া দরকার যে, বর্তমানে বিশ্বের নানা প্রান্তে প্রচলিত ধর্মনিরপেক্ষতার গৃহীত সংজ্ঞার সঙ্গে আমাদের দেশের দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা। আধুনিক গণতন্ত্রে গির্জা ও রাষ্ট্রকে পৃথক করে রাখাই ধর্মনিরপেক্ষতার পূর্বশর্ত। অন্যদিকে আমাদের দেশে ধর্মনিরপেক্ষতা মানে 'সর্ব ধর্ম সমভাব' অর্থাৎ সকল ধর্মকেই একভাবে সম্মান করা। বিষয়টির মধ্যে কিন্তু কোনও অবজেক্টিভ বিশ্লেষণের চেয়ে নানাভাবে ধরে নেওয়া সাবজেক্টিভিটিরই প্রাধান্য রয়েছে। এই নির্দিষ্টতার অভাব অর্থে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের বহুলাংশই যুগান্তব্যাপী রীতি রেওয়াজ বা ধ্যান ধারণার মধ্যে দিয়ে অনুসৃত হয়ে আসাকেই বোঝায়। এরই পরিণতিতে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠের ধর্মকে বহু অনভিপ্রেত পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়েছে। দাঁড়াতে হয়েছে রাষ্ট্রের সরাসরি হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে, যা অন্য কোনও ধর্মের ক্ষেত্রে ঘটেনি। অন্য দেশেও সাম্প্রতিক অতীতে এমন নজির নেই। পরিস্থিতি দেখেশুনে মনে হয় রাষ্ট্র যেন দেশের হিন্দু অধিবাসীদের অবিশ্বাস করে। ধর্মনিরপেক্ষতার বর্ম তখন আর রাষ্ট্রের থাকে না, সে খুল্লাম খুল্লা হিন্দুদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির ওপর প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে চায়।

ভারতবর্ষে হিন্দুদের পূজাস্থল ও কেবলমাত্র হিন্দু ধর্মেরই প্রতিষ্ঠানগুলির ওপর কেমন প্রশাসনিক অনুপ্রবেশ ঘটেছে তা দেখা যাক।

(১) প্রতিষ্ঠানের ওপর নিয়ন্ত্রণ ও তার পরিচালনায় যোগ দেওয়া, (২) এই ভাবে নাক গলিয়ে প্রচলিত ধর্মীয় আচারে বদল ঘটানো, (৩) ধর্মস্থানগুলির প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক বিষয়গুলিতে হস্তক্ষেপ করে সেখানকার অর্থ অন্য ক্ষেত্রে স্থানান্তরিত করা, (৪) দেশের মন্দিরগুলির আয়কে আয়করভূক্ত করা, (৫) কোনও ধর্মীয় সংস্থার অধীনে যদি কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয় তার পরিচালন পর্ষদেও সরকারি লোক ঢুকিয়ে দেওয়া, (৬) হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি যদি কোনও সরকারি অনুদান পেয়ে থাকে সেক্ষেত্রে তারা নিজ ধর্মবিশ্বাসী কাউকে নিয়োগের ক্ষেত্রে বাড়তি সুবিধে দিতে পারবে না।

অবশ্যই এর কিছু ভালো দিক হয়তো আছে যেমন, সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান হলে নিয়োগের ক্ষেত্রে তারা ধর্মভিত্তিক বৈষম্য করতে পারবে না। ভালো কথা। কিন্তু অন্য কোনও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এই নিয়ম মানা হবে না, কেবলমাত্র হিন্দু প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেই এটা জারি থাকবে, এটা তো কিছুতেই হজম করা যায় না। আর কেবলমাত্র হিন্দু মন্দিরের ক্ষেত্রেই সরকার নিযুক্ত প্রশাসক মন্দিরের ভক্তদের ও ক্রিয়াকর্মের ক্ষেত্রে শেষ কথা বা ফতোয়া জারি করবেন, এটাও চূড়ান্ত বৈষম্যমূলক। আর ধর্মনিরপেক্ষতার প্রশ্নে এই আচরণ সম্পূর্ণ বিরোধী অবস্থানে রয়েছে, তা যে কোনও মানদণ্ডেই বিচার করা হোক না কেন।

বাস্তবিক ধর্মের ওপর এই ধরনের প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ অদ্ভুত। বিশ্বে অনেক ধর্মভিত্তিক (Theocratic) দেশ আছে যারা সংখ্যাগরিষ্ঠের ধর্ম ছাড়া অন্য ধর্মের ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক আচরণ করে। এই সব দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠের ধর্মই সরকারি ধর্ম— যেমন পাকিস্তান বা সৌদি আরব। অন্যদিকে এমন কিছু দেশও রয়েছে যারা ধর্মভিত্তিক হয়েও বহু ক্ষেত্রে অন্যান্য ধর্মের প্রতিও কিছুটা ধর্মনিরপেক্ষতা প্রদর্শন করে থাকে। পরধর্মের প্রতি তুলনামূলকভাবে কম অসহিষ্ণুতা দেখায়— যেমন অতীতের অটোমান সাম্রাজ্য বা আজকের দুবাই। আবার নামে ধর্মনিরপেক্ষ দেশ হলেও তুরস্ক কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠের ধর্মের প্রতিই পক্ষপাতিত্ব করতে অভ্যস্ত। এই নিরিখে ভারত সত্যিই এক বিচিত্র দেশ। ভারতই একটি মাত্র গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র যেখানে প্রশাসন কেবলমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠের পূজা অর্চনার ওপর নাক গলায়। তাহলে প্রশাসনের তৎপরতায় যে সমস্ত ধর্মীয় সংস্কার সাধিত হয়েছে সেগুলির তাৎপর্য কী? নিশ্চিতভাবেই আমাদের সকলেই কি সতীপ্রথা বিলোপ, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ বা তিন তালাকের মতো প্রথার বিলয়কে সমর্থন করি না? হ্যাঁ, অবশ্যই করি। কিন্তু এগুলির সঙ্গে পুরী বা শবরীমালা মন্দিরের ক্ষেত্রে যে বিধিনিষেধ রয়েছে তার মূলগত পার্থক্য রয়েছে। দু'টি ক্ষেত্রেই ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের (বিশ্বের প্রাচীনতম গণতান্ত্রিক দেশ যারা গির্জা ও রাষ্ট্রকে আলাদা করে

সাবধান নকল তালমিছরি কিনে ঠকবেন না

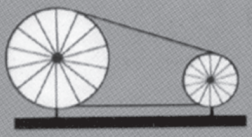

স্বদেশী আন্দোলনের যুগেও
বাংলার ঘরে ঘরে ছিল
বিশ্বস্ত একটাই নাম

চির পরিচিত
দুলালের®
তালমিছরি

আজও তার জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ বাংলার প্রতিটি ঘরেই।
সাধারণ অল্প সর্দি - কাশিতে দুলালের তালমিছরি চুষে
খাওয়াই যথেষ্ট। আর সর্দি - কাশি বেশী হলে একটা
লবঙ্গ ও একটু আদা সহ দুলালের তালমিছরি
এক সঙ্গে ফুটিয়ে চায়ের মতন দু' বার খান
— দারুণ কাজ দেবে।

ভারত সরকারের R ® চিহ্ন দেখে তবেই কিনুন

দুলালের তালমিছরি — সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরী

দুলালের তালমিছরি ৪, দত্তপাড়া লেন, কলকাতা - ৭০০ ০০৬, ফোন - ২২১৮ ৫৬৭৩, ২২১৮ ০৫৪৩

রাখতে সম্পূর্ণ দায়বদ্ধ ও সফল) মধ্যে থেকে উদাহরণ দেওয়া যায়।

প্রথমত দেশের তার প্রতিটি নাগরিকের সংবিধান প্রদত্ত ব্যক্তিগত অধিকারকে রক্ষা করার দায়বদ্ধতা আছে। এই দায়বদ্ধতা তখনও বলবৎ থাকবে যখন কিনা ওই ব্যক্তির সম ধর্মাবলম্বী কোনও বড় গোষ্ঠী বা দল সেই ধর্মের আচার কিছুটা অন্যভাবেও যদি পালন করে। এই সূত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদাহরণ দিয়ে বলা যায়— যেখানে কোনও শিশুর সম্ভাব্য রোগের প্রতিষেধক খাওয়ানোর ক্ষেত্রে সেদেশের আদালতের রায়ে বলা হয়েছে ''যদি কোনও নির্দিষ্ট ধর্মাবলম্বীর সে দেশে বসবাসকারী প্রাপ্তবয়স্করা তাদের শিশুকে ওই প্রতিষেধক খাওয়ানো ধর্মবিরোধী বলে মনে করে সেক্ষেত্রে তাদের কথা অগ্রাহ্য করা হবে। শিশুটি প্রতিষেধক খাবে''।

ভারতের ক্ষেত্রে সতীপ্রথা, জাতিবৈষম্য ও তাৎক্ষণিক তিন তালাকের বিষয়গুলি এই গোত্রীয়। এক্ষেত্রে সরকারের হস্তক্ষেপ একান্তই যুক্তিসঙ্গত কেননা তা নাগরিকের নিজস্ব অধিকারগুলি সুরক্ষিত করে। এই বিষয়গুলি নাগরিকের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে। আর আমাদের সংবিধান অনুযায়ী সমস্ত নাগরিক যাতে সমান অধিকার পায় তা নিশ্চিত করা সরকারের কর্তব্য। ওপরের বিষয়গুলি সম-অধিকার রক্ষার পরিপন্থী।

মার্কিন দেশে আবার এরই বিপরীত অবস্থানের আদালতের রায়ও রয়েছে। কোনও কেক বিক্রেতা সে দেশে সমলিঙ্গের বিবাহের ক্ষেত্রে কেক বিক্রি করা অস্বীকার করতে পারে, কেননা এ বিষয়ে তার হয়তো ধর্মীয় অন্য বিশ্বাস আছে। এর ফলে হয়তো কেউ কেউ হতাশ হয়ে পড়তে পারেন। কিন্তু নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এর মধ্যে একটি সচল ধারাবাহিকতা রয়েছে। আচ্ছা, কেউ কি একজন ইহুদি বা মুসলমানকে শুয়োরের মাংস বিক্রি করায় বাধ্য করতে পারে? উল্লেখিত নিরাশ সমলিঙ্গের বর-কনে অন্য কোনও দোকান থেকে কেক কেনার চেষ্টা করতে পারে। কিন্তু একটি শিশুর ক্ষেত্রে যেখানে তার অভিভাবকরা তার টিকাকরণে ধর্মীয় জিগির তুলে প্রতিবন্ধকতা নিয়ে আসছে, সেখানে একমাত্র সরকারই তাকে স্বাস্থ্য সুরক্ষা দিতে পারে।

সরকারি হস্তক্ষেপের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় তফাতটি হলো নাগরিকের পূজা অর্চনার স্থলে অভিভাবকত্ব করা। আগে বলা নাগরিকদের দৈনন্দিন জীবনে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলতে পারে এমন বিষয়ের সঙ্গে কিন্তু এই বিষয়টি সম্পর্কহীন। এখানে বিতর্ক দেবস্থানে ক্রিয়াকর্ম, আচার সংহিতা নিয়ে। প্রত্যেক নাগরিকের ইচ্ছানুসারে ধর্মাচরণের অধিকার আছে। এমনকী ধর্মাচরণ না করারও অধিকার আছে। কিন্তু কোনও নাগরিকের নিজস্ব ধর্মবিশ্বাস বা এ সংক্রান্ত মত একই ধর্মের অন্যের ওপর বা বৃহত্তর গোষ্ঠীর ওপর চাপিয়ে দেওয়ার কোনও অধিকার তার নেই।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, নাগরিক নিজ মর্জিমাফিক যে কোনও প্রক্রিয়ায় তার ধর্মাচরণ করার অধিকারী। কিন্তু বিশেষ কিছু করতে হলে তা তাকে প্রকাশ্যে নয় নিজের ব্যক্তিগত পরিসরে করতে হবে। নির্দিষ্ট ধর্মাবলম্বীদের যৌথভাবে পূজা অর্চনার ক্ষেত্রে যা অন্য কারুর কোনও ক্ষতি সাধন করছে না সেক্ষেত্রে যৌথ আচরিত পূজার নিয়ম কানুন বা বিধিনিষেধকেই মান্যতা দিতে হবে। এখানে ব্যক্তিগত অধিকার প্রযোজ্য নয়। পূজাস্থলকে কর্মক্ষেত্র, স্কুল বা কলেজের সঙ্গে এক করে ফেললে চলবে না। মেয়ে শিক্ষার্থীরা প্রায়শই তাদের পোশাক-আশাক নিয়ে ক্ষোভ ব্যক্ত করে। তারা নিজেদের পছন্দের জামাকাপড় পরে কলেজ বা ক্যাম্পাসে যেতে চায়। এটা অবশ্যই সঠিক। এ অধিকার তাদের রয়েছে। কিন্তু বৌদ্ধ স্তূপ বা শিখ গুরুদ্বারে প্রবেশের সময় কোনও দর্শনার্থীই সেখানকার প্রচলিত dress code থাকলে তা পরতে অস্বীকার করে না। এই ধারাতেই ইংল্যান্ডের বহু মসজিদে মেয়েদের পেছন দিকে বসার জায়গা দেওয়া হয় কিন্তু নাগরিক পরিবহণ বা বাসে যদি এই নিয়ম চালু হয় সরকার তা বরদাস্ত করবে না। এর কারণ প্রথমটিকে তারা একান্তই ধর্মাচরণ-সম্পৃক্ত বলে মনে করে, দ্বিতীয়টিকে নয়।

“তাহলে দেখা যাচ্ছে, নাগরিক নিজ মর্জিমাফিক যে কোনও প্রক্রিয়ায় তার ধর্মাচরণ করার অধিকারী। কিন্তু বিশেষ কিছু করতে হলে তা তাকে প্রকাশ্যে নয় নিজের ব্যক্তিগত পরিসরে করতে হবে। নির্দিষ্ট ধর্মাবলম্বীদের যৌথভাবে পূজা অর্চনার ক্ষেত্রে যা অন্য কারুর কোনও ক্ষতি সাধন করছে না সেক্ষেত্রে যৌথ আচরিত পূজার নিয়ম কানুন বা বিধিনিষেধকেই মান্যতা দিতে হবে। এখানে ব্যক্তিগত অধিকার প্রযোজ্য নয়।”

দীপাবলীর শুভেচ্ছা সহ—

SUNITA JHAWAR

কাউন্সিলার ও বিজেপি নেত্রী

৪২ নং ওয়ার্ড, কোলকাতা পুরসভা

KISHAN JHAWAR

উত্তর-পশ্চিম কোলকাতা জেলা সভাপতি

বিজেপি

Mobile : 9830050425

Lotus Rang Udyog

DEALS IN - DYES & CHEMICALS

26/4-A, Armenian Street.
Kolkata - 700 001

Mobile No. 9830014898

2268-2717, 2218-2931

E-mail : ranjeet.Lunia@yahoo.in

Wish you very happy :

BISHWANATH DHANANIA

With Best Compliment-

Ecomoney Insurance Brokers Pvt. Ltd.

নরেন্দ্র মোদীই ভারতবর্ষের শেষ আশা

রবীন্দ্রনাথ দাস

আমরা ভারতীয়রা বিশেষ করে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুরা খুবই বিস্মৃতিপরায়ণ, অর্থাৎ ভুলে যাই সহজেই। আমরা ভুলে গেছি কীভাবে ১৯৪৭ সালে কংগ্রেস আর কমিউনিস্ট মিলে মুসলমানদের জন্য রাতারাতি আমাদের জীবন্ত ভারতকে কেটে দু' টুকরো করেছিল। আমরা ভুলে গেছি, ১৯৪৬ সালের কলকাতা ও নোয়াখালির নরসংহারের কথা।

আমরা বাদুরিয়া, কালিয়াচক, বারাসত, ধুলাগড়, বসিরহাটের মুসলমানদের দ্বারা আক্রান্ত অসহায় হিন্দুপরিবারগুলির কথা মনে রাখি না। মনে রাখি না সিপিএমের সংগঠিত সাঁইবাড়ির হত্যাকাণ্ড বা বিজন সেতুর উপর দিনদুপুরে ১৭ জন আনন্দমার্গী সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীকে কী নির্দয়ভাবে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছিল! তার আসামিরা অর্থাৎ সিপিএমের সেই গুন্ডারা আজও কিন্তু বেঁচে আছে এবং বহাল তবিয়তেই আছে! মনে আছে তো ২০০২-এর ফেব্রুয়ারি মাসের গোধরায় সবরমতী এক্সপ্রেসে ৫৯ জন অসহায় মহিলা ও শিশুসহ অযোধ্যা-ফেরত করসেবকদের কীভাবে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল ৬০ লিটার পেট্রল ঢেলে?

১৯৪৭ সালে ধর্মের ভিত্তিতে ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করার পর কংগ্রেসের পেশাহীন ও হিন্দু নামধারী দুই ব্যারিস্টার গান্ধী-নেহরু সমাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার সূচনা করেন। যাঁরা দুজনেই ছিলেন অনভিজ্ঞ। আর সেই সময়ে যাঁরা যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন, তাদের বহিষ্কার করে অথবা মেরে ফেলে, নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য গদি দখল করে বসেছিলেন। আর যার ভয়াবহ পরিণাম হয়েছিল একের পর এক ঘোটালা। আজ দিল্লিতে নরেন্দ্র মোদীর সরকার এসেছে, তাই আমরা হিন্দুরা বেঁচে রয়েছি। তা না হলে ২০১১ সালের কংগ্রেসের তৈরি প্রিভেনশন অব কমিউনাল অ্যান্ড টারগেটেড ভাইওলেন্স বিল আনা হতো। যার কবলে পড়লে সমস্ত হিন্দুর কপালে জুটতো ঔরংজেবের থেকেও ভয়াবহ আর ভয়ঙ্কর শোষণ ও নিপীড়ন। আধমরা হিন্দুদের একেবারে মেরে ফেলার শেষ পেরেকটা ছিল ওই বিলে। ভগবানের অশেষ কৃপাবলে ভারত ২০১৪ সালের মে মাসে নরেন্দ্র মোদীকে পেয়েছে প্রধানমন্ত্রী রূপে। গত চার বছর ধরে নরেন্দ্র মোদী দিনে ১৮ ঘণ্টা কাজ করে, ভারতের সুরক্ষা ব্যবস্থাকে মজবুত করে দিয়েছেন যার ফলে পাকিস্তান বা চীনের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করতে সক্ষম হয়েছে ভারত। ফ্রান্সের দেওয়া রাফেল, স্বদেশজাত অগ্নি-৭ আর ব্রহ্মোস এবং রাশিয়ার দেওয়া এস. ৪০০ আন্টি-মিসাইল রক্ষাকবচের সাহায্যে ভারত আজ পৃথিবীতে চতুর্থ বিশ্বমহাশক্তিতে পরিণত হতে চলেছে। তাছাড়াও ভারত স্বদেশি কারিগরিতে প্রস্তুত করেছে সুখোই এম.কে.আই. ৩০,আকাশ, ধ্রুব, পিনাক এবং পৃথিবীর মতো মারাত্মক অনেক মিসাইল, অরিহন্তের মতো অত্যাধুনিক যুদ্ধ জাহাজ, অর্জুন ও বজ্রের মতো শক্তিশালী ট্যাঙ্ক। এ সমস্তই কিন্তু নরেন্দ্র মোদীর অকুণ্ঠ অনুমোদনে ভারতের তথা পৃথ্বীর শ্রেষ্ঠ প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠান ডি. আর. ডি.ও-র ইঞ্জিনিয়ার ও বিজ্ঞানীরা করে দেখিয়েছেন মাত্র চার বছর সময়ের মধ্যেই।

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই নেহরুর স্টালিনপন্থী সমাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার শিকার হয়েছিলেন কারা? অপদার্থ, ভ্রষ্ট নেতারা কী কেন্দ্রে অথবা কী রাজ্যে অনৈতিক ভাবে ক্ষমতা দখল করে একের পর এক দুর্নীতির সঙ্গে কীভাবে অসংখ্য ঘোটালার মাধ্যমে ভারতের অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দিয়েছিল? অথচ বিখ্যাত অর্থশাস্ত্রী এস. গুরুমূর্তির কথায়, 'এমনকী অষ্টাদশ শতাব্দীতেও ভারত আর চীনের সামগ্রিক জি.ডি.পি. সারা বিশ্বের নিরিখে ছিল ৩৯ শতাংশ'। নেহরুর মতো দুর্নীতিবাজ প্রধানমন্ত্রীর অফিস থেকে শুরু করে অর্থাৎ উপর থেকে নীচতলা অর্থাৎ পিয়ন-পেয়াদারা পর্যন্ত সবাই ঘুষ খেত! সর্বত্রই ছিল চরম বিশৃঙ্খলা। নেহরু বেছে বেছে শুধু হিন্দু উদ্যোগপতি ও শিল্পপতিদেরই শিকার বানাতেন যেমন এখন মমতা ব্যানার্জি করছেন পশ্চিমবঙ্গে। আমি শুধু মনে করিয়ে দিচ্ছি। ডালমিয়ারা ছিলেন কৃষ্ণভক্ত হিন্দু শিল্পপতি এবং তাঁরা কংগ্রেসের ঘনিষ্ঠ ছিলেন। তাঁদের কাছে মোটা চাঁদা চাইলেন নেহরু ইলেকশনের জন্য। কিন্তু ডালমিয়ারা তা দিতে অস্বীকার করেন। তারপরের দিন সকালেই পুলিশের রেইড হলো তার বাড়িতে আর জেল হলো ডালমিয়াকে মিথ্যা কেসে ফাঁসিয়ে। এখন যেমন মমতা ব্যানার্জি করছেন বিজেপির নেতা এবং কর্মীদের উপর অথবা পিনারাই বিজয়ন করছেন আর.এস.এস. এবং বিজেপি কর্মীদের উপর কেরলে। জ্বলন্ত উদাহরণ ত্রিলোচন মাহাতো। বয়স মাত্র ১৮ বছর। তাকে মেরে গাছে গাছে টাঙিয়ে দেওয়া হলো। প্রচার করা হলো আত্মহত্যা করেছে। মনে আছে প্রিয়াংকা আর রিজওয়ানের কথা? হিন্দু মেয়ে আর মুসলমান ছেলে। লাভ জিহাদের শিকার। মৃত রিজওয়ানের ভাইকে করা হলো তৃণমূলের এম.এল.এ.। এটা মমতার পুরস্কার কেননা সে মুসলমান। মুসলমান ভোটব্যাঙ্ক ও তোষণনীতির চরণ উদাহরণ। আর অন্য দিকে অশোক তোদীকে দিতে হলো তৃণমূলের পার্টি ফান্ডে কোটি কোটি টাকা এবং গোটা সল্টলেকের সমস্ত মাড়োয়ারিদের ভোট সংগ্রহের গুরুভারের দায়িত্বও নিতে হলো তাঁকে। এটা হলো তাঁর ক্ষতিপূরণ ও শাস্তি। কেননা সে হিন্দু।

মিথ্যা কেসে ফাঁসানো, জাল, জুয়াচুরি, ঘুষ কালোবাজারি এসব ব্রিটিশ আমলে থাকলেও হয়তো এতটা প্রকট হয়নি কখনও। তখনকার কংগ্রেসের মধ্যে কিছু ভালো লোক

ছিলেন। কিন্তু সংখ্যায় অতি নগণ্য, কারণ দুর্নীতিপরায়ণ প্রধানমন্ত্রী নেহরুর প্রচণ্ড দাপট। লাল বাহাদুর শাস্ত্রী অবশ্য এর ব্যতিক্রম ছিলেন। তাঁর দেওয়া 'জয় জওয়ান, জয় কিষান' স্লোগানে অনুপ্রাণিত হয়ে সমস্ত দেশবাসী স্বেচ্ছায় সোমবারে উপবাস করে। তার জন্যই ১৯৬৫ সালে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধের সময় রসদ সরবরাহ করা সম্ভব হয়েছিল। অবশ্য দেশভক্ত এই মহান নেতাকে বেশিদিন বেঁচে থাকতে দেওয়া হয়নি। যখন কংগ্রেসের ভ্রষ্টাচার চরমসীমায় পৌঁছেছিল, অর্থব্যবস্থা প্রায় পঙ্গু হয়ে পড়েছিল সেই সময় অল্প কয়েক মাসের জন্য জনতা দলের চন্দ্রশেখরকে প্রধানমন্ত্রী করা হয়। তাঁর সময়েই 'ব্যাঙ্ক অব ইংল্যান্ড'-এর কাছে ভারতের সমস্ত সোনা গচ্ছিত রেখে অনুদান বা ঋণ নেওয়া হয়েছিল। যে ভারত একদিন সারা পৃথিবীকে অন্নদান করে অন্নপূর্ণা ও লক্ষ্মীর ভাণ্ডার হয়েছিল, তাকেই কিনা আমেরিকার পশুখাদ্য পি. এল. ৪৮০-র গম আর অস্ট্রেলিয়া থেকে খাদ্যশস্য আমদানি করতে হয়েছিল। ধন্য কংগ্রেসি সরকার! গত ৭০ বছরে ৭০টারও বেশি ঘোটালা করেছে কিন্তু তা সত্ত্বেও কিছু মানুষ আজও সেই কংগ্রেসকে ভোট দিচ্ছে। এ টু জেড একটা করে শুরু করলে সত্যিই ৭০টারও বেশি কেলেঙ্কারির সঙ্গে সমস্ত কংগ্রেসি নেতাদের নাম জড়িয়ে আছে। অবশ্য সুরেশ কালমাদি এবং লালু এখন যদিও জেলে কিন্তু সাধারণ কয়েদিদের মতো নয়, বেশ সুখেই তাঁদের রাখা হয়েছে। তামিলনাড়ুর কুখ্যাত কানিমোজী আর কালানিধি মারান ভ্রষ্ট ও লোভী উকিল আর জজের সাহায্যে জেলের বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আদর্শ বাসস্থান যোজনা, ২জি, স্পেকট্রাম কেলেঙ্কারি, কয়লা, কোলগেট, কার্গিল যুদ্ধের কামান বোফোর্স, মারুতি ও জিপ-কেলেঙ্কারি মায় মৃত জওয়ানদের জন্য বরাদ্দ কফিনের উপরও সওদা করা এইসব নীতিহীন দেশদ্রোহীদের বাঁচানোর জন্য এক পল্টন নামিদামি উকিল যেমন প্রশান্তভূষণ, অভিষেক মনু সিংভী, কপিল সিব্বলের মতো শয়তান থেকে শুরু করে সমস্ত হিন্দি-বাংলা-ইংলিশ চ্যানেলের তথাকথিত সত্যবাদী সাংবাদিক এবং ফোটোগ্রাফারের দল অহর্নিশ ফ্রি সার্ভিস দিচ্ছেন ওইসব ভ্রষ্ট নেতাদের। পুলিশ কমিশনার, আই.পি.এস. এবং আই.এ.এস. অফিসাররা এইসব লোভী রাজনেতাদের পদলেহী দাসানুদাস হয়েছেন।

এই যখন দেশের অবস্থা তখন ভারতমাতার সুসন্তান অটলবিহারী বাজপেয়ী অল্প সময়ের জন্য এসেছিলেন দেশের ভেঙে পড়া অর্থব্যবস্থাকে মজবুত করতে আর আগ্রাসী চীন আর তার দোসর পাকিস্তানের কুটিল দৃষ্টি থেকে দেশকে সুরক্ষা প্রদান করতে। তাঁরই প্রচেষ্টায় পোখরানের সফল আণবিক পরীক্ষণ— সমস্ত ভারতবাসীর মনে এনে দিয়েছিল দৃঢ় আত্মবিশ্বাস। সারাবিশ্বকে স্তম্ভিত করে দিয়েছিল ভারতীয় বিজ্ঞানীদের অভূতপূর্ব প্রজ্ঞা আর পারদর্শিতা। তাঁর সময়েই এতদিনের বিশ্বব্যাঙ্কের কাছে জমে থাকা কংগ্রেসি আমলের বকেয়া ঋণ সম্পূর্ণ রূপে শোধ হতে পেরেছিল। এবং অতিরিক্ত বাজেটও পেশ করতে সক্ষম হয়েছিলেন তিনি। ভারতবাসীর এতদিনের এত বিশাল ঋণের বোঝা লাঘব করার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব কিন্তু ভারতরত্ন প্রয়াত অটলবিহারীর।

ঠিক সেই একই ঘটনা নরেন্দ্র মোদীর আমলেও। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর রঘুরাম রাজনের হিসাব মতো ৫২ লক্ষ কোটি টাকার ঘাটতি হয়েছিল সোনিয়া সরকারের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ আর তার সুযোগ্য সহকারী অর্থমন্ত্রী পি. চিদাম্বরমের কারসাজিতে। মেহুল চোস্কি, বিজয় মাল্য, নীরব মোদী— এরা সব তাদেরই ঘৃণ্য ঘোটালার ফসল। আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি নরেন্দ্র মোদীকে যিনি ২০১৪ সালের মে মাসে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর গুরুভার গ্রহণ করেছেন। মা ভারতীর আরও এক সুযোগ্য সন্তান অটলবিহারী বাজপেয়ীজীর সুযোগ্য উত্তরসূরি। অটলবিহারী একাধারে কবি, সুবক্তা ও লেখক ছিলেন। আজীবন অবিবাহিত থেকে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবকের প্রচারক থেকে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন।

তাঁরই সুযোগ্য শিষ্য নরেন্দ্র মোদীর জন্যই আজ আগ্রাসী চীনের ভুটান দখল করার বাসনা অপূর্ণ থেকেছে। ডোকলাম থেকে পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হয়েছে। চীনের 'ওয়ান বর্ডার ওয়ান রোড' নামক মারাত্মক অর্থনৈতিক পরিকল্পনা এবং 'স্ট্রিং অব পার্ল' নামক সামরিক পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছে। নরেন্দ্র মোদীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে জাতীয় সুরক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা অজিত দোভালের পরামর্শে এবং জাতীয় সড়ক যোজনার যশস্বী মন্ত্রী নীতীন গড়করির অক্লান্ত প্রচেষ্টায় ভারতের উত্তরপূর্বের সাতটি রাজ্যের সঙ্গে দিল্লির আকাশ এবং স্থলপথে যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হয়েছে। এটা সমারিক দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক পদক্ষেপ। বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও চীনের সঙ্গে ভারতের সুদীর্ঘ সীমান্ত রয়েছে। সেখানে শত্রুসেনার মোকাবিলা করার জন্য চাই উন্নত মানের সড়ক পরিযোজনা।

আজকের ভারত আবার পুরনো দিনের মতো বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে তেজগতিতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হয়েছে। আজকে ভারতের জি.ডি.পি. ৮.২ যা ইউরোপের বহু উন্নত দেশের থেকেও বেশি। আর এটা সম্ভব হয়েছে মাত্র ৪ বছরে নরেন্দ্র মোদীর অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিষ্ঠার কারণে। এই চার বছরে আমরা কেউই শুনিনি কোনও ঘোটালার কথা। আমলা থেকে পিওন পর্যন্ত দেশসেবার মনোভাব নিয়ে নিরন্তর অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন। আজ দেশের সর্বত্যাগী প্রধানমন্ত্রী যিনি নিজেও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবকের প্রচারক ছিলেন এবং সেখান থেকেই দেশসেবার ব্রতে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তিনি ১২৫ কোটি ভারতবাসীকে নিজের পরিবার বলে মেনে নিয়েছেন বলেই আজ তাঁর নিজস্ব কোনও ব্যাঙ্ক ব্যাল্যান্স নেই, আছে দুর্জয় সাহস আর অদম্য উৎসাহ। স্বচ্ছ ভারত অভিযান, প্রদূষণ-মুক্ত পৃথিবী, 'আয়ুষ ভারত' সারা বিশ্বের সব থেকে বড় 'স্বাস্থ্য পরিযোজনা' নিরুপণের মাধ্যমে তিনি সংযুক্ত রাষ্ট্রের অতি সম্মাননীয় খেতাব 'দ্য চ্যাম্পিয়ন অব দ্য আর্থ' পদবিতে সম্প্রতি ভূষিত হয়েছেন। সৌদি আরবের সুলতান সালমান আব্দুল আজিজের কাছ থেকে সর্বোচ্চ নাগরিক

সম্মানে সম্মানিত হয়েছে। সেই নরেন্দ্র মোদীই আবার সৌদির পরম শত্রু ইরানেরও ঘনিষ্ঠ সহযোগী হতে পেরেছেন বলেই চাবাহারে ভারতীয় নৌসেনার জন্য বন্দর বানানোর বিশেষ অনুমতি প্রাপ্ত হয়েছেন। এ তাঁর অনন্য প্রচেষ্টারই ফসল। একদিকে যেমন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানেয়াহুর প্রিয় বন্ধু, আবার অন্যদিকে সিরিয়ায় সাহায্যকারী বিশ্বের সব থেকে শক্তিশালী রাষ্ট্রপ্রধান ভ্লাদিমির পুতিনেরও অন্তরঙ্গ হচ্ছেন নরেন্দ্র ভাই মোদী। নিজস্ব সুখকে বিসর্জন দিয়ে তিনি প্রতি বছর কালীপূজার রাত্রিতে শত্রু পরিবেষ্টিত কাশ্মীরের সাংঘাতিক শীতকে উপেক্ষা করে সেনাবাহিনীর জওয়ানদের সঙ্গে উৎসব পালন করেন। শুনেছেন কি, সেনাদের জন্য সমর্পিত প্রাণ অন্য কোনও পূর্ববর্তী প্রধানমন্ত্রীকে এরকম করে দীপাবলীর উৎসব উপভোগ করতে? চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের দুই হাজার বছর পর, মা ভারতীর আরও এক বীরসন্তান নরেন্দ্র মোদীর কোনও এক শুভক্ষণে ভারতভূমিতে আবির্ভাব হয়েছে।

আজ তাঁরই অক্লান্ত প্রচেষ্টায় ভারতেই তৈরি হচ্ছে যুদ্ধপোত, যুদ্ধজাহাজ, বোমারু বিমান আর বিশালাকায় পারমাণবিক শক্তিচালিত সাবমেরিন। ভারত এতদিন শুধু যুদ্ধাস্ত্র বিদেশ থেকে আমদানি করতো কিন্তু তাঁর দূরদর্শিতার কারণে ভারত আজ প্রতিরক্ষা সামগ্রীর উৎপাদনে স্বনির্ভর হতে পেরেছে। শুধু তাই নয়, ভারত দক্ষিণ এশিয়ার কম্বোডিয়া ও ভিয়েতনামের মতো বহু দেশকে বহুমূল্য যুদ্ধাস্ত্র রপ্তানিও করতে সমর্থ হয়েছে। নরেন্দ্র মোদীর অনুপ্রেরণায় আকৃষ্ট হয়ে ভারতের আন্তঃর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিজ্ঞানীরা অন্তরীক্ষ গবেষণা সংস্থা ইসরোকে সারা বিশ্বের উন্নত দেশগুলির সমপর্যায়ে নিয়ে যেতে সমর্থ হয়েছেন। আজ আমেরিকার নাসা ও ইসরোর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় চন্দ্রে মানুষের পদার্পণ বা মঙ্গলায়নের অভিযান সফল করার পরিকল্পনা চলছে। বিশাল ভারতবর্ষের প্রতিটি প্রদেশের সঙ্গে বিমান এবং স্থলপথে যোগাযোগ ব্যবস্থার রূপকার কিন্তু তিনিই। এই প্রসঙ্গে তাঁর যোগ্য সহকর্মী হিসাবে নীতীন গড়করির নাম অবশ্যই করব। সম্প্রতি সিকিম রাজ্যে, ৪৫০০ ফুট উঁচুতে অবস্থিত এবং গ্যাংটক থেকে মাত্র ৩৫ কিমি দূরে প্যাকিয়ং বিমানবন্দর দ্বারা প্রতিটি প্রদেশের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য বিশেষ বিমানসেবার সুবিধা করা হয়েছে। এটা দেশের মধ্যে শততম বিমানবন্দর। সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে এটা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। জ্বালানি তেলের অভাবে আজ পৃথিবীর সব দেশই বিপর্যস্ত। মধ্যপ্রাচ্যের কট্টর ইসলামিক মতাদর্শে আসক্ত আরবদেশগুলির তাই রমরমা বাজার। তাছাড়া আছে পরিবেশন দূষণের অভিশাপ। পেট্রলের ধোঁয়া থেকে উৎপন্ন কার্বন ও সালফার-ডাই অক্সাইড ইত্যাদি মারাত্মক গ্যাসের জন্য অস্বাভাবিক ভূমণ্ডলীয় উত্তাপের সৃষ্টি হচ্ছে। সেই কারণে আজ সবাই বিকল্পশক্তির সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছে। নরেন্দ্র মোদীর জন্যই ভারত আজ বিশ্বের মধ্যে সর্ববৃহৎ সৌরশক্তি উৎপাদনে প্রথম স্থান লাভ করতে পেরেছে। তাই তাঁরই সফল প্রয়াসে আগামী ২০২০ সালের মধ্যে ভারতের সর্বত্র বিদ্যুৎ চালিত যানবাহনের ব্যবস্থা করা হবে। নরেন্দ্র মোদীর প্রিয় বন্ধু জাপানের রাষ্ট্রপ্রধান সিনজো আবের সহায়তায় ভারতে 'বুলেট' ট্রেনের সুবিধা প্রাপ্তির গৌরব কিন্তু তারই প্রাপ্য। 'উজ্জ্বলা যোজনা'র দ্বারা ৫ কোটি গ্রামীণ মহিলাকে বিনামূল্যে ধোঁয়াহীন উনুনের ব্যবস্থা করা, তাঁর এই মাত্র চার বছরের অল্প সময়ের মধ্যে অসামান্য অবদানগুলির মধ্যে অন্যতম। 'বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও' নরেন্দ্র মোদীর আরও এক অসামান্য অবদান। তাছাড়া জি.এস.টি. এবং বিমুদ্রীকরণের যুগান্তকারী পদক্ষেপের মতোই অটল পেনশন যোজনা, গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া, প্রধানমন্ত্রী আবাস এবং গ্রামসড়ক যোজনা, জনধন যোজনা, জীবন- জ্যোতি ও সুরক্ষা বিমা যোজনা, ইন্দ্রধনুষ মিশনের সাহায্যে অসংখ্য শিশুর টিকাকরণ, জন-আরোগ্য যোজনা ছাড়াও এল.ই.ডি. বাল্ব এবং এল.পি.জি. গ্যাস সিলিন্ডারের কথা তো সংযুক্ত রাষ্ট্রপ্রধান পর্যন্ত জেনে গেছেন। কিছু অকৃতজ্ঞরাই শুধু খবর রাখেন না!

নরেন্দ্র মোদীর অক্ষয়কীর্তি ভারত তথা বিশ্বের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। কীভাবে তিনি গত দুই দশক ধরে গৃহশত্রুদের দৈনিক অভিশাপ ও গুপ্তহত্যার চক্রান্তকে প্রতিরোধ করে অক্লান্ত পরিশ্রমের দ্বারা ভারতকে আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছেন। চীন, পাকিস্তান ছাড়াও কিছু দেশ ভারতের শত্রু। কিন্তু তাঁর মিত্রের সংখ্যাও কিছু কম নয়। 'তিন তালাক'-প্রাপ্ত মুসলমান মহিলারাও তাঁকে রাখি পাঠান নিয়ম করে প্রতি রক্ষাবন্ধন উৎসবে। 'সুন্নি' বা 'ওহায়বি' মুসলমানরা তাঁকে দুশমন ভাবেন, কিন্তু 'শিয়া' সম্প্রদায়ের মুসলমানরা কিন্তু তাঁকে খুবই ভালোবাসেন। তবে মৌলভি আর মিশনারিদের থেকেও তাঁর বড় শত্রু হচ্ছে দেশীয় জলহাওয়ায় পরিপুষ্ট কালোবাজারি, ভ্রষ্ট, লোভী, রাজনেতা আর তাদেরই পদলেহী আমলারা। তাই আজ আমাদের সেইসব শত্রুদের একবার চিনে নিতে হবে! তারা শুধু নরেন্দ্র মোদীর গুপ্তহত্যার ষড়যন্ত্রকারীই নয়, তারা সমস্ত ভারতবাসীর জন্যই বিপজ্জনক। তারা কারা? ভ্যাটিকনের মদতপুষ্ট মাইনো সোনিয়া গান্ধী পরিচালিত কংগ্রেস পার্টি, মাও আর মার্কসের মতাদর্শে অনুপ্রাণিত কমিউনিস্টরা, তথাকথিত 'বুদ্ধিবেচা'র দল যারা নাকি সেকুলার আর তথাকথিত গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভরূপী বিশ্বাসঘাতক সাংবাদিকরূপী কিছু শকুনির দল।

নরেন্দ্র মোদীর অসমান্য অবদানগুলির বর্ণনা এই সামান্য লেখায় অসম্পূর্ণই রইল। সমস্ত সুধী পাঠকবৃন্দকে অনুরোধ, শুধু নিজে পড়া নয়, অন্যকেও পড়ান, বাড়ির লোকদের ও বন্ধুবান্ধবদের পড়ান। কেননা সময় খুব কম।

(লেখক বিশিষ্ট চিকিৎসক ও অধ্যাপক)

ভুল সংশোধন

স্বস্তিকা পত্রিকার ১৫ অক্টোবর সংখ্যায় সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পটুয়াটোলার বন্দ্যোপাধ্যায় বাড়ির ঐতিহ্যমণ্ডিত দুর্গোৎসব' প্রবন্ধে 'আমার শ্বশুরালয়ের' স্থানে 'আমার মাসিমার শ্বশুরালয়ের' পড়তে হবে। অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য দুঃখিত। —**স্ব: স:**

রাজ্যের নাম বদল নিয়ে রাজ্য সরকারের ঘ্যানঘ্যানানি

বিনয়ভূষণ দাশ

সম্প্রতি সংবাদসূত্রে প্রকাশ, পশ্চিমবঙ্গের নাম পরিবর্তন বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক থেকে কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রকের কাছে কিছু বিষয়ে জানতে চাওয়া হয়েছে, যে বিষয়গুলি বাংলাদেশ ও ভারতের পারস্পরিক সম্পর্ক সংশ্লিষ্ট। এরই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের নাম পরিবর্তনের বিষয়টি সম্পর্কিত। তাই সমগ্র বিষয়টি পুনরাবলোকন করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, পশ্চিমবঙ্গের নাম বদলের উদ্দেশ্যে রাজ্য বিধানসভায় একটি প্রস্তাব পাশ হয়েছে। বিজেপি বাদে সমস্ত দল প্রস্তাবটি সমর্থন করেছে। প্রস্তাবে রাজ্যের নাম পশ্চিমবঙ্গের বদলে 'বাংলা' রাখার কথা বলা হয়েছে। এই নিয়ে চারবার— একবার বাম সরকারের সময় এবং তিনবার তৃণমূল সরকারের সময়ে এই প্রস্তাব করা হয়েছে এবং এখন এটি কেন্দ্রীয় অনুমোদনের জন্য কেন্দ্রে পাঠানো হচ্ছে। যথাক্রমে ১৯৯৯, ২০১১, ২০১৬ ও ২০১৮-তে এই প্রস্তাব বিধানসভায় পাশ এবং কেন্দ্রের অনুমোদনের জন্য পাঠানো হচ্ছে। এই নিয়ে চতুর্থবার। প্রাসঙ্গিক বিষয়টির 'যুক্তি, তক্কো আর গপ্পো' নিয়ে একটু 'ঘ্যানঘ্যান' করা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। গত ২ আগস্ট, ২০১৬ ও আবার ২৬ জুলাই ২০১৮ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রাজ্য মন্ত্রীসভা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, পশ্চিমবঙ্গ নামটি পরিবর্তন করে রাজ্যের নাম করা হবে বাংলা এবং বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন নাম নয়, একটিই নাম সব ভাষায়। আর, তাতেই বাঙ্গালি আবার বিভক্ত। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, গত ২০১১ সালে এই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়েরই প্রথম তৃণমূল সরকার বিধানসভায় একটি সর্বদলীয়, সর্বসম্মত প্রস্তাব গ্রহণ করে সেটি কেন্দ্রের কাছে পাঠিয়েছিল অনুমোদনের জন্য। তাতে রাজ্যের নাম সব ভাষাতেই পশ্চিমবঙ্গ করার প্রস্তাব করা হয়েছিল। তখন কেন্দ্রে কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন ইউ পি এ-২ সরকার ছিল। সেটি কেন গৃহীত হয়নি? রাজ্য কি কেন্দ্রের কাছে কোনও তদ্বির করেছিল? না করে থাকলে কেন করেনি? এর উত্তরগুলি কিন্তু ভীষণ জরুরি। একই তৃণমূল সরকারের একই মুখ্যমন্ত্রী পাঁচ বছর পরে, ২০১৬ সালে অন্যরকম আবার ২০১৮ সালে এসে আরও অন্যরকম সিদ্ধান্ত কেন গ্রহণ করলেন? রহস্যটা কী?

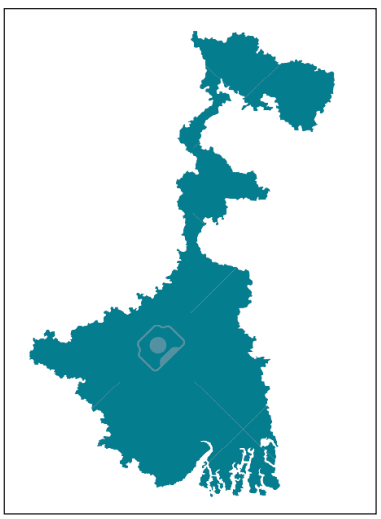

যাইহোক, যুক্তি-তক্কো আর গপ্পোর গপ্পোটা নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করা যাক। ২০১৬ সালের প্রস্তাবে রাজ্যের নাম বঙ্গ বা বাংলা করার প্রস্তাব করা হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে বলা যায়, 'বঙ্গ' নামটি প্রাচীন হলেও ভূগোলের দৃষ্টিতে সমগ্র বাংলা কখনোই বঙ্গ নামে পরিচিত ছিল না। বঙ্গ নামটি প্রথম পাওয়া যায় ঐতরেয় আরণ্যকে— 'ইমাঃ প্রজাস্তিস্রা অত্যায়ামায়ো স্তানিমানি বয়াংসি। বঙ্গাবগধাশচের পাদান্যন্যা অর্কমভিতঃ বিবিস্র ইতি।।' রামায়ণে বঙ্গের উল্লেখ আছে। মনু-সংহিতায় তৎকালীন ভারতের পূর্বসীমার উল্লেখ করে বলা হয়েছে 'অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্র মগধেষু চ। তীর্থযাত্রাং বিনা গচ্ছন পুনঃ সমস্কারং অর্হতি।।' এছাড়াও বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ নিয়ে যে অখণ্ড বাংলা ছিল, সেই বাংলার বিভিন্ন অংশ, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অংশ তখন পুণ্ড্রবর্ধন, গঙ্গারিডই, উড়ুম্বর বা টাণ্ডা, গৌড়, রাঢ় ইত্যাদি নামে পরিচিত ছিল। আর বাংলার পূর্ব অংশ বিভিন্ন সময়ে 'সমতট', 'হরিকেল', চন্দ্রদ্বীপ' বঙ্গ ইত্যাদি বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। যদিও, তখন 'বঙ্গ' বলতে ঢাকা ও তার আশপাশের অঞ্চলগুলিকেই বোঝাত। পরবর্তীকালে সমতট, বঙ্গ ইত্যাদি অংশ 'বাঙ্গালা' নামে অভিহিত হয়। ২০১৬ সালে 'হার্ভার্ডের' ইতিহাসের অধ্যাপক ড. সুগত বসু এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন যে, 'বাঙ্গালা' বা বাংলা নামটি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইলিয়াস শাহের সময় থেকে প্রচলিত হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য আধুনিক ঐতিহাসিকগণ এ বিষয়ে সহমত নন। বাংলাদেশের বিখ্যাত ঐতিহাসিক আব্দুল করিম লিখেছেন, ''এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, প্রাক-মুসলমান আমলেও বঙ্গ বা বাঙ্গালা নামের প্রচলন ছিল'' (বাংলার ইতিহাস— সুলতানি আমল)। মুসলমানদের আগমনের অনেক আগেই 'বাংলা' নামের উৎপত্তি হয়েছে। রাজেন্দ্র চোলের 'তিরুমলয়' শিলালিপিতে প্রথম 'বাংলা' নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই শিলালিপিটি মুসলমান বিজয়ের আগেকার। কালক্রমে, এই 'বাঙ্গালা' শব্দটিই পর্তুগিজ বণিকরা গ্রহণ করে এবং ক্রমান্বয়ে অন্যান্য ইউরোপীয় বণিকগণ গ্রহণ করে। নামটি ইংরেজিতে দাঁড়ায় 'Bengal'। কিন্তু এই ভৌগোলিক অঞ্চলে বসবাসকারী বাঙ্গালিরা এ অঞ্চলকে 'বাংলা' অথবা 'বাংলাদেশ' নামেই উল্লেখ করে থাকে। বাঙ্গালি কবি, সাহিত্যিক, নাট্যকার, ঐতিহাসিক তাঁদের লেখায় এ অঞ্চলকে 'বঙ্গ', 'বাংলা' অথবা 'বাংলাদেশ' নামে অভিহিত করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বঙ্গিমচন্দ্র, ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অমলেন্দু দে এবং অনান্য কবি, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক ও বুদ্ধিজীবীগণ তাঁদের লেখায় 'বঙ্গ', 'বাংলা', 'বাংলাদেশ' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করেছেন। ইংরেজ সরকারও তাঁদের বিভিন্ন বাংলা বিজ্ঞপ্তিতে

'বাংলাদেশ'ই ব্যবহার করেছে। রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত গান, 'আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে' এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যায়। আবার, 'পূর্ববঙ্গ' বা 'পূর্ববাংলা' এবং 'পশ্চিমবঙ্গ' বা 'পশ্চিমবাংলা' শব্দদুটিও ১৯৪৭ সালে বিভক্ত হয়ে দেশ স্বাধীন হবার অনেক আগে থেকেই প্রচলিত ছিল এবং আছে মৌখিক আর লিখিত দুইভাবেই। একশো বছরেরও আগে লেখা দুর্গাচন্দ্র সান্যালের 'বাংলার সামাজিক ইতিহাস'-এ বাংলার দুটি অংশকে 'পূর্ববাংলা' এবং 'পশ্চিমবাংলা' বলে অভিহিত করা হয়েছে।

হাসান শাহিদ সুরাওয়ার্দি, শরৎচন্দ্র বসু, আবুল হাশেম, কিরণশঙ্কর রায় প্রমুখ নেতা 'সার্বভৌম স্বাধীন বাংলাদেশ' গঠন প্রচেষ্টাপর্বে তাঁদের আলোচনায়, প্রস্তাবে, প্রচারিত বক্তব্যে বাংলার পশ্চিম অংশকে 'পশ্চিমবঙ্গ' বলেই অভিহিত করেছেন। স্বাধীন হবার সময় থেকে এ রাজ্যের নাম সরকারিভাবেই 'পশ্চিমবঙ্গ' হিসেবে স্বীকৃত হয়, আর ইংরেজিতে ওয়েস্ট বেঙ্গল। এইভাবে এক দীর্ঘ ঐতিহাসিক 'বিবর্তনের' মাধ্যমে রাজ্যটি 'পশ্চিমবঙ্গ' হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে।

এবার 'তক্ক'তে আসা যাক। তক্কটা হলো, কেন্দ্রের বিভিন্ন সভাসমিতিতে নাকি পশ্চিমবঙ্গের ইংরেজি নামের ওয়েস্ট বেঙ্গল-এর আদ্যক্ষর ডব্লিউ-এর কল্যাণে মুখ্যমন্ত্রী বা অন্য প্রতিনিধি শেষে বলার সুযোগ পান, ফলে তার আর বেশি বলার সুযোগই থাকে না। সুতরাং, রাজ্যের নাম পাল্টে 'বঙ্গ' বা 'বাংলা' করলেই রাজ্য প্রতিনিধি অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রী বেশি বলার সুযোগ পাবেন। এ অনুযোগটি একেবারে নতুন। এর আগে ড. বিধানচন্দ্র রায় বা জ্যোতি বসুর রাজ্যের কথা বলতে অসুবিধা হয়েছে বলে শুনিনি। রাজ্যের যা কিছু উন্নয়ন তা তো বিধান রায়ের সময়ই হয়েছে; তাঁর কোনও অসুবিধা হয়েছিল বলে তো কখনো শুনিনি। তামিলনাড়ু বা উত্তরপ্রদেশেরও কোনও অসুবিধা হয়নি। ওরাও তো শেষেই বক্তব্য রাখার সুযোগ পায়। অভিযোগ তো শুনিনি।

শুধু বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্ষেত্রেই অসুবিধাটা হয়েছে কি? পাঁচ বছর আগের পাঠানো প্রস্তাবটাই কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের কাছে তদ্বির করে পাশ করে নিলেই তো হতো। নাম সব ভাষাতেই এক হয়। ইংরেজি এবং হিন্দিতেও পশ্চিমবঙ্গ করিয়ে নিলেই তো হতো। উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ বা মহারাষ্ট্রের নাম তো অন্য ভাষায় অনুদিত করে বলা বা লেখা হয় না। পশ্চিমবঙ্গই বা অন্য ভাষায় অনুদিত করে বলা হবে কেন? 'পশ্চিমবঙ্গ' পশ্চিমবঙ্গেই থাকলে মুখ্যমন্ত্রীও অনেক আগেই বলার সুযোগ পান আর বাঙ্গালির ভাবাবেগও আহত হয় না।

কিন্তু না, রাজ্যের নাম পরিবর্তন করতে হবে। একই মুখ্যমন্ত্রী, একই দলের সরকার পাঁচ বছর আগের সিদ্ধান্ত থেকে পশ্চাদপসরণ করেছে। ২০১৬ সালে শিক্ষামন্ত্রী ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেছিলেন, সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পশ্চিমবঙ্গের নাম পরিবর্তন করে বাংলায় 'বঙ্গ' অথবা 'বাংলা', ইংরেজিতে বেঙ্গল আর হিন্দিতে 'বঙ্গাল' করা হবে। এরকম একটা অবাস্তব প্রস্তাব তিনি দিতে পেরেছিলেন ভাবলে অবাক হতে হয়। সেই প্রস্তাব মাঠে মারা যেতেই তাঁরা আবার প্রস্তাব করেছেন, সব ভাষাতেই 'বাংলা' করা হবে। বাংলাই কেন? গৌড়, রাঢ়, পুণ্ড্রবর্ধনই বা নয় কেন? বাংলার পশ্চিম অংশের নাম তো এগুলিই ছিল। তাম্রলিপ্তও দেওয়া যেতে পারে। আদিতে 'বঙ্গ' বা 'বাংলা' বলতে পূর্ববঙ্গের বিশেষ বিশেষ অঞ্চলকেই বোঝাত। ইতিহাসের বিবর্তনের অপলাপই যদি করতে হয় তাহলে 'পুণ্ড্রবর্ধন'ই সঠিক নাম। যদিও ভারতের কিছু রাজ্য সঠিক, সচেতনভাবেই ইতিহাসের বিবর্তনকে স্বীকার করে 'বিহার', 'ওড়িশা' বা অসমে পরিণত হয়েছে; মগধ, কলিঙ্গ অথবা কামরূপে থেমে থাকেনি।

ইতিহাসের 'বিবর্তনের' গতিকে পিছন দিকে 'এগিয়ে' দেবার পক্ষে নানা যুক্তিজাল বিস্তার করা হচ্ছে এই পশ্চিমবঙ্গে। যেমন, পূর্ববঙ্গই তো আর নেই, সে অংশ তো পূর্ব পাকিস্তান থেকে এখন 'বাংলাদেশ'। হ্যাঁ, তা হয়েছে। সেটাও কিন্তু ইতিহাসের এক বিরাট অপলাপ। অংশ নিয়ে নিল পূর্ণের নাম; পূর্ববাংলা হয়ে গেল সম্পূর্ণ 'বাংলাদেশ'। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক এবং 'বাংলাদেশের ইতিহাস'-এর লেখক ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার এর তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। আর 'পশ্চিম' থাকলেই 'পূর্ব' থাকতে হবে এরকম একটা অর্বাচীন যুক্তিও দেবার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু এ যুক্তি ধোপে টেকে না। উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ আছে; কিন্তু পূর্বপ্রদেশ, দক্ষিণপ্রদেশ অথবা পশ্চিমপ্রদেশ নেই। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া আছে কিন্তু উত্তর-পশ্চিম এশিয়া নেই। সুতরাং 'পশ্চিমবঙ্গ' থাকলেই 'পূর্ববঙ্গ' থাকতে হবে এটা অর্বাচীনের যুক্তি। অনেকে আবার ঔপনিবেশিকতার মোহজাল থেকে বেরিয়ে আসতে পারেননি। তাঁরা একই রাজ্যের একটা ইংরেজি নামও চাইছেন। তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশের নাগরিকদের এই প্রয়োজন না থাকলেও আমাদের রাজ্যের এই সব কর্তাভজা বাবুদের আছে। আবার শ্রীমতী কৃষ্ণা বসু (প্রাক্তন এমপি এবং ইংরেজি সাহিত্যের প্রাক্তন অধ্যাপিকা) বলেছেন, ''পশ্চিমবঙ্গ নামটার সঙ্গে এক দুঃখের স্মৃতি জড়িয়ে আছে; সুতরাং এ নাম বিদায় নিক''। অনেকটা একই ধরনের কথা বলেছেন চিত্রপরিচালক গৌতম ঘোষ। তিনি বলেছেন, 'পশ্চিমবঙ্গ' নামটার সঙ্গে জড়িয়ে আছে দেশভাগের স্মৃতি। এটা স্মরণে আনে উদ্বাসনের সেই দুঃখজনক স্মৃতি, ফিরিয়ে আনে ফেলে আসা বাড়ি, সম্পত্তি, জন্মস্থান আর সেখানে বেড়ে উঠার স্মৃতি। ''তিনি আরও বলেছেন, রাজ্যের নতুন নাম সেই স্মৃতি পেছনে ফেলে আসবে। তিনি বুদ্ধিজীবী বলে পরিচিত কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সেই কথা ভুলে গেছেন, ''যেন ভুলে না যাই, বেদনা পাই শয়নে, স্বপনে।'' শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এঁরাও প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন; কিন্তু বাস্তবে সেই বৈতসী বৃত্তি অবলম্বন করেছেন। এরা 'কেবল পালিয়ে বেড়ায়, দৃষ্টি এড়ায়''। কিন্তু মজা হচ্ছে, এঁরাই ঘটা করে 'হিরোশিমা' দিবস, 'বাবরি ধ্বংস' দিবস ইত্যাদি পালন করে থাকেন। এগুলি কিসের স্মৃতি বহন করে? অবাক লাগে, কোনও ইতিহাস সচেতন মানুষ এসব উচ্চারণ করতে পারেন? কলকাতা নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে বীভৎস, নারকীয়, ১৯৪৬-এর জঘন্যতম কলকাতার নরসংহারের সেই ভয়াবহ স্মৃতি। শ্রীমতী বসু আর গৌতম ঘোষের যুক্তি মানলে কলকাতার নাম বদলে দিতে হয়। কথায় আছে, অতীত খুঁড়লে এক চোখ হারাতে হয়;

কিন্তু অতীত ভুললে দু'চোখ হারায়।

পশ্চিমবঙ্গ সৃষ্টির সঙ্গে জড়িয়ে আছে ইতিহাস বিবর্তনের অনেক সংগ্রামের, ত্যাগের, আন্দোলনের, ধর্ষণ, গণহত্যা আর পৃথিবীর মানবসমাজের ইতিহাসে বৃহত্তম 'উদ্বাসনের' নিষ্ঠুর ইতিহাস। পশ্চিমবঙ্গ সৃষ্টির সঙ্গে জড়িয়ে ছিলেন বিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালি মনীষার বিভিন্ন বিষয়ের দিকপাল, প্রতিভায় ভাস্বর ব্যক্তিগণ। হাসান শাহিত সুরাওয়ারদি, আবুল কাশেম, শরৎচন্দ্র বসু প্রমুখ কয়েকজন মুসলিম লিগেরই 'প্রক্সি-প্লান', ভারত ও পাকিস্তানের বাইরে এক ''স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ'' গঠনের প্রস্তাব করে যা বাস্তবে হিন্দু বাঙ্গালিকে ধ্বংস করার পরিকল্পনা, পুরো বাংলাকেই পাকিস্তানে ঢুকিয়ে দেবার পরিকল্পনা। প্রস্তাবটি কোনও অংশেরই সমর্থন পায়নি। ফলে প্রস্তাবটি বাস্তবায়িত হতে পারেনি। আর প্রস্তাবের প্রবক্তারাও বাংলার রাজনীতিতে প্রান্তিক শক্তিতে পরিণত হন। মুসলিম লিগের এই ছলচাতুরী, গণহত্যা, দাঙ্গার বিরুদ্ধে বাংলার মানুষ ক্ষুব্ধ হয়ে ভারতের মধ্যেই এক আলাদা রাজ্য, 'পশ্চিমবঙ্গের' জন্য সংগঠিত হন। 'পশ্চিমবঙ্গ' গঠনের জন্য ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক, ভাষাবিদ প্রভৃতি সেই সময়কার সর্বস্তরের বুদ্ধিজীবী ও সাধারণ মানুষ এগিয়ে আসেন। সেই সময়কার সেক্রেটারি অব স্টেট ফর ইন্ডিয়া লর্ড লিস্টওয়েলের কাছে 'পশ্চিমবঙ্গ' গঠনের জন্য ৭ মে, ১৯৪৭ তারবার্তা প্রেরণ করেন বাংলার পাঁচজন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ— ঐতিহাসিক স্যার যদুনাথ সরকার, ড. রমেশচন্দ্র মুজমদার, বৈজ্ঞানিক ড. মেঘনাদ সাহা, ড. শিশির মিত্র এবং ভাষাবিদ ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। তারবার্তায় তাঁরা লেখেন, ''Education, trade and industry in Bengal have almost collapsed owing to recurrent riots, causing insecurity of life and property. The present communal Ministry (of H.S. Surawardy) is totally incapable of maintaining law and order. We strongly support the immediate formation of a separate West Bengal province guaranteeing under a non-communal Ministry, safety of life and unhindered progress in education, industry and commerce, with continuance and development of Calcutta–a vital part of West Bengal, as a moral, intellectual, social and economic centre.'' একই তারবার্তা তাঁরা Sir Stafford Cripps এবং Sir John Anderson কেও পাঠান। আর, সর্বোপরি, ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় রাজনৈতিকভাবে একক ও নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যান মুসলিম লিগ ও তার দোসর 'স্বাধীন, সার্বভৌম, স্বতন্ত্র বাংলাদেশ' গঠনের প্রবক্তাদের হাত থেকে হিন্দুবাঙ্গালির বাসস্থান 'পশ্চিমবঙ্গ' ছিনিয়ে আনতে। পূর্বোক্ত পাঁচজন বাঙ্গালি বুদ্ধিজীবী ছাড়াও এ ব্যাপারে তিনি সাহায্য ও সহযোগিতা পান ঐতিহাসিক ড. সুরেন্দ্রনাথ সেন, কবি ড. অমিয় চক্রবর্তী (এক সময়ে কবি রবীন্দ্রনাথের সচিব ছিলেন), বেঙ্গল প্রভিনশিয়াল ডিপ্রেসড ক্লাস লিগের সম্পাদক আর দাস, আইনবিদ নীহারেন্দু দত্তমজুমদার, ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী, বিমলচন্দ্র সিংহ, হিন্দু মহাসভার নেতা ব্যারিস্টার নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (মার্কসবাদী নেতা সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পিতা), মেজর জেনারেল এ সি চট্টোপাধ্যায়, কংগ্রেস নেতা সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, ঋষি শ্রী অরবিন্দ, কলকাতার তৎকালীন মেয়র এস সি রায়চৌধুরী প্রমুখ তৎকালীন বাংলার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের। পূর্ব ও উত্তরবঙ্গের হিন্দুপ্রধান অঞ্চলগুলো পশ্চিমবঙ্গে যুক্ত করার ব্যাপারে বিশেষভাবে চেষ্টা করেন ঐতিহাসিকদ্বয় স্যার যদুনাথ সরকার এবং ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার। তৎকালীন বাংলার কিছু বৃহৎ জমিদারগণও 'পশ্চিমবঙ্গ' সৃষ্টিতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। যেমন, বর্ধমানের মহারাজা স্যার উদয়চাঁদ মহতাব, কাশিমবাজারের মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী, মহারাজা প্রবেন্দ্রমোহন ঠাকুর, মহারাজকুমার শীতাংশুকান্ত আচার্যচৌধুরী (সিপিএম নেতা স্নেহাংশু আচার্যের পিতৃদেব)।

এই ভাবে মূলত ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নিরলস প্রচেষ্টা ও অন্যান্য বিশিষ্টজনের সহায়তায় 'পশ্চিমবঙ্গ' রাজ্য গঠিত হয়। বিশিষ্ট সাংবাদিক শঙ্কর ঘোষ স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরের তিন শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি রাজনীতিকদের মধ্যে প্রথম স্থানে রেখেছেন ড. শ্যামাপ্রসাদকে। তিনি লিখেছেন, ''শ্যামাপ্রসাদ যখন শ্রীনগরে বন্দিদশায় মারা যান তখন তাঁর বয়স ৫২। ওই বয়সে বিধানচন্দ্র রাজ্যস্তরের নেতা, জ্যোতি বসু অনেক কমিউনিস্ট নেতার একজন'' (হস্তান্তর— ১ম খণ্ড)।

এই ভাবে, এত ত্যাগ, আন্দোলন, গণহত্যা, দেশান্তর, ধর্মান্তর, উদবাসন, আর তৎকালীন রাজনৈতিক নেতাগণ, সামাজিক নেতা ও বুদ্ধিজীবীদের আন্দোলন ও নিরন্তর প্রচেষ্টার ফলে যে 'পশ্চিমবঙ্গ' গঠিত হয়েছে তার ইতিহাস ভুলিয়ে দেবার, এই বাংলার সৃষ্টিকর্তা ড. শ্যামাপ্রসাদের অবদান ভুলিয়ে দেবার এক দুরভিসন্ধিমূলক চেষ্টা শুরু হয়েছে। বাঙ্গালি বুদ্ধিজীবী যাঁরা বিদেশ থেকে এসে মাঝে মাঝে 'বাণী' বিতরণ করেন এবং যাঁরা রাজ্যে থেকেও কেবলমাত্র ব্যক্তিস্বার্থ দ্বারা চালিত হন— তাঁরা 'বৈতসী' বৃত্তি অবলম্বন করেছেন। কিন্তু এই রাজ্যের বিবেকবান, সমাজ সচেতন সাহিত্যিক তিলোত্তমা মজুমদার, ঐতিহাসিকদ্বয় রজতকান্ত রায় (বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য) এবং সুরঞ্জন দাস (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য) রাজ্যের নাম পরিবর্তনের বিপক্ষে ও ঐতিহ্য রক্ষার স্বপক্ষে তাঁদের মত ব্যক্ত করেছিলেন ২০১৬-তে। রাজ্যবাসী বাঙ্গালি নাগরিকগণও রাজ্যের ইতিহাস ও ঐতিহ্য ভুলিয়ে দেবার বিপক্ষে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, সম্প্রতি বর্তমান বাংলাদেশের কিছু সাংস্কৃতিক সংস্থা বিধানসভায় পাশ হওয়া এই প্রস্তাবের বিপক্ষে তাঁদের মতামত জানিয়ে এই নামকরণ থেকে বিরত থাকার অনুরোধ জানিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে। আন্তর্জাতিক নিয়মকানুনও আছে এ ব্যাপারে। নাম পরিবর্তন নিয়ে রাজ্য সরকারের এই 'ঘ্যানঘ্যানানি' তাঁরা আর চাইছে না। তাঁরা চায়, রাজ্যের নাম 'পশ্চিমবঙ্গই' থাকুক এবং অনুদিত নয়, সব ভাষাতেই রাজ্যের নাম হোক 'পশ্চিমবঙ্গ'। আমরাও চাই, পশ্চিমবঙ্গ থাকুক পশ্চিমবঙ্গেই।

(লেখক প্রাক্তন ব্যাঙ্ক আধিকারিক এবং ইতিহাস গবেষক)

চিঠিপত্র

পঞ্চায়েত ভোট

পঞ্চায়েত ভোটের আগে নমিনেশন জমা নিয়ে তৃণমূলের সমর্থকরা একদফা হাঙ্গামা ও খুনোখুনি আরম্ভ করলে তৃণমূলনেত্রীর অভিযোগের আঙুল সিপিএম ও বিজেপির দিকে। এখন প্রশ্ন ৩৪ শতাংশ আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তৃণমূল জিতলো কাদের শক্তিবলে? পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে এইসব ধোঁকাবাজির কথা শুনিয়ে বিভ্রান্ত করে রাজনৈতিক স্বার্থ কতদিন টিকিয়ে রাখবে? আমরা বিগত শতাব্দীতে ৭২-এ কংগ্রেসের সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের চেলাদের দৌরাত্ম্য দেখেছি এবং কেমন করে মিলিয়ে গেল তাও দেখেছি। নিজের হাতের ফ্র্যাঙ্কেস্টাইন চেলা তৈরি করে পরবর্তীকালে তাদের ধরপাকড় করে জেলের ঘানি টানিয়ে কিছুটা পাপস্খালন করে গেছেন। পরবর্তী সময়ে ওই চেলাদের রক্তবীজ ৩৪ বছর জ্যোতি-বুদ্ধর মঞ্চ দাপিয়ে এখন তৃণমূলের মঞ্চ আলোকিত করে বেড়াচ্ছে। বিগত পঞ্চায়েত ভোটে বাকি আসনে ভোট চলাকালীন যেসব হাঙ্গামা ও খুনোখুনি হয় তৃণমূল দলনেত্রী বহিরাগত তত্ত্ব ফেঁদে পার্শ্ববর্তী বিজেপি শাসিত ঝাড়খণ্ড থেকে গুন্ডাবাহিনী এনে বিজেপি এই অশান্তির জন্য দায়ী অভিযোগের আঙুল তুলে নিজের দলের গুণ্ডাবাহিনীর কুকীর্তির দায় ঝেড়ে ফেললেন। এ যেন শাক দিয়ে মাছ ঢাকা। কতদিন চলবে এই মিথ্যার বেসাতি। অতি সম্প্রতি বাকি ৩৪ শতাংশ বিনাযুদ্ধে জেতা আসনে আদালতের রায় সপক্ষে বেরোনোর পর বোর্ড গঠনে নিজের দলের অভ্যন্তরে বিশৃঙ্খলা ও খুনোখুনি আরম্ভ হয়ে গেছে পদ নিয়ে। নেত্রী সাপের পাঁচ পা দেখার মতো বিরোধীদের প্রতি একটা আগ্রাসী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে সিপিএম ও বিজেপির দিকে অভিযোগের আঙুল তুলে বিরোধীদের গুটিকয় আসনগুলি হাতিয়ে নেওয়ার জলঘোলা আরম্ভ করে দিয়েছেন। এ রাজ্যে সিপিএম কার্যত সাইনবোর্ড সর্বস্ব দলে পরিণত হয়ে গেছে, বিজেপির উত্থানে যাতে বাড়া ভাতে ছাই না পড়ে কংগ্রেসের অধীর যেমন তৃণমূল-বিজেপির আঁতাত দেখছে, সেইরকম তৃণমূল নেত্রীও সিপিএম-বিজেপির আঁতাতের অভিযোগ এনে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির আসল রং চিত্র পাল্টে দেওয়ার খেলায় মত্ত আছেন। পরিশেষে তৃণমূল নেত্রী ও কংগ্রেস নেতা অধীরকে স্মরণ করিয়ে দিই, তাহলে সুজন-মান্নানের হরিহর আত্মা কি নিছক 'গট-আপ গেম'? এখেলা বন্ধ করে দেখুক অবশিষ্ট মুসলমান ভোট কাদের ঝোলা পরিপূর্ণ করে।

—বিরূপেশ দাস,
বর্ধমান।

পাঁচ রাজ্যের নির্বাচন ও বিজেপি

বাংলার পুজোর উৎসব শেষ হতেই শুরু হবে পাঁচ রাজ্যের (রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, তেলেঙ্গনা ও মিজোরাম) বিধানসভা নির্বাচন। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন উক্ত পাঁচ রাজ্যের ভোটের দিনক্ষণ, দফা ও ফলাফলের দিন ঘোষণা করেছে। এবং উক্ত রাজ্যগুলির শাসক ও বিরোধী দলের মধ্যে তৎপরতাও শুরু হয়ে গেছে। এবং তৎপরতা শুরু হয়েছে গুটি কয়েক মিডিয়ার মধ্যেও। তারা প্রাক্ নির্বাচনী সমীক্ষা ঘোষণা করেছে এবং তাতে বেশ কিছু রাজ্যে বিজেপি বিরোধী দলগুলিকে এগিয়ে রেখেছে। তবে এই সমীক্ষা যে মোদী এবং বিজেপি বিরোধী তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অনেকটাই পরিকল্পিত ও ইচ্ছাকৃত ভাবে বিজেপিকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য এই সমীক্ষা। ওই মিডিয়ারা জনগণকে বোঝাতে চাইছে যে ভারতবর্ষে বিজেপি তার সমর্থন হারাচ্ছে। কিন্তু ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যে ভাবে একক দক্ষতায় দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও প্রতিরক্ষা বিষয়ে ভারতকে মজবুত ভিতের উপর প্রতিষ্ঠা করেছেন তাতে উক্ত মিডিয়াগুলির করা 'নাম কা ওয়াস্তে' সমীক্ষা যে ভুল প্রতিপন্ন হবে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ভারতবর্ষের সুরক্ষা উন্নতি ও ভবিষ্যৎ যে নরেন্দ্র মোদীর হাতেই ন্যস্ত তা সমস্ত ভারতবাসীর মতো ওই পাঁচ রাজ্যের মানুষও জানেন। তা যতই ভ্রান্তিকে আঁকড়ে ধরে রাফাল যুদ্ধবিমান কেনা নিয়ে রাহুল গান্ধী তোপ দাগুন না কেন!

—নরেশ মল্লিক, পূর্বস্থলী-২,
পুর্ববর্ধমান।

ভারতীয়দের সমনাগরিক অধিকার চাই

আমি একজন বোনাফাইড ভারতীয়, কিন্তু সাতপুরুষের ভিটে হারা বিতাড়িত উদ্বাস্তু। আমি যে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট দিনে ছিলাম ভারতীয়, স্বাধীনতা সংগ্রামী। শাঁক উলু ধ্বনির বন্দে মাতরম্ মন্ত্র উচ্চারণে তেরঙা পতাকা উত্তোলন করে পুষ্পবৃষ্টি ও মিষ্টি বিতরণ করে ১৫ আগস্ট বহু সংগ্রাম ও রক্তের বদলে নবভারতের প্রথম স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের স্বপ্ন নিয়ে শান্তি নিদ্রা গেলাম। হাজার বছর পর আমাদের ভারতমাতা ও আমরা শৃঙ্খল মুক্ত হলাম। আমরা দখল মুক্ত হলাম। গভীর রাতে 'আল্লাহু আকবর' গগন বিদারী চিৎকারে ঘুম ভেঙে গেল। শুনতে থাকলাম পাকিস্তান জিন্দাবাদ, হিন্দুস্থান মুর্দাবাদ, ভারত ধ্বংস হোক, নিপাত যাক। ঘরের বাহিরে বের হয়ে জানলাম আমি আজ থেকে ভারতীয় নয়, আমি একজন পাকিস্তানি। শুধু পাকিস্তানি নয়, পাকিস্তানের শত্রু বা এনিমি। ভারতের দালাল, কাফির, মালাউন। এদেশে থাকবার কোনও অধিকার নেই আমার। আমার সমস্ত সম্পত্তি হয়ে গেল এনিমি প্রপার্টি। আমার মাঠের পাকাধান কেটে নিয়ে গেল, পুকুরের মাছ, গোয়ালের গোরু, গোলার ধান লুটপাট করে নিল ওরা। শত্রুসম্পত্তি কেড়ে নেওয়া, অগ্নিদগ্ধ করা তাদের হক অর্থাৎ অধিকার। তাদের লোলুপ দৃষ্টি এসে পড়লো আমাদের মা-বোনের উপর। ধর্ষিতা হলো তাঁরা, স্তন কেটে নিয়ে উল্লাসের খেলায় মেতে উঠলো

তারা। হত্যা করা হলো হাজার হাজার অবরুদ্ধ নিরীহ ভারতবাসীকে। বলপূর্বক ধর্মান্তর করা শুরু হলো। আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হলো তাঁদের সাত পুরুষের বসতবাড়ি। শুরু হলো নিপীড়িত নির্যাতিত অত্যাচারিত পাকিস্তানে অবরুদ্ধ ভারতীয়দের জীবনের নতুন অধ্যায়। ধর্মীয় সভা ও জীবন রক্ষার জন্য ভিটে মাটি ছেড়ে পালানোর পালা। কোটি কোটি ভিটে হারা মানুষ এসে আশ্রয় নিলো খণ্ডিত ভারতের রেল স্টেশনে, রেল লাইনের ধারে ও বিভিন্ন উদ্বাস্তু শিবিরে। মৃত্যু হলো হাজার হাজার শিশু ও বৃদ্ধবৃদ্ধার। আমাদের নতুন পরিচিতি হলো পাকিস্তানের রিফিউজি। দলে দলে জোর করে নিয়ে যাওয়া হলো ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের জনমানবহীন জঙ্গল ও মরুভূমিতে। এমনকী আন্দামান দ্বীপে। সুজলা সুফলা আমার সোনার বাংলা ছেড়ে অজানা অচেনা ধুসর অনুর্বর বদ্ধ ভূমিতে আমাদের নির্বাসন দেওয়া হলো। আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবহীন দুর্বিসহ জীবন। শুরু হলো আবার বেঁচে থাকার লড়াই। পরিবর্তন হলো আমার মুখের ভাষা, আমার কৃষ্টি ও সংস্কৃতি, এমনকী খাদ্যাভ্যাস। যারা শিবির থেকে পালিয়ে এসে বাংলার মরিচঝাঁপির জঙ্গলে আশ্রয় নিলো তাঁদের গুলি করে মারা হলো। কী অন্যায় করেছিল তাঁরা? হায়রে! আমার সাধের স্বাধীনতা। কত মা সন্তান হারা হলো, কত শিশু অনাথ হলো, কে রাখে তার হিসাব? তারপর আমার পরিচিতি আমি একজন উদ্বাস্তু অর্থাৎ রিফিউজি।

স্বাধীনতার ৭০ বছর পর একই ধারা অব্যাহত। শত অত্যাচার সহ্য করে যারা পাকিস্তানে রয়ে গেল তার পরিচিতি কাফের, মালাউন ভারতের দালালে অভিষিক্ত। বীর স্বাধীনতা সংগ্রামীরা এর থেকে মুক্ত নয়। আমার অতি প্রয়োজনে জমি বিক্রি বন্ধ। উচ্চ সরকারি চাকুরি বন্ধ। সীমান্ত বন্ধ, ভারতে গমন দেশদ্রোহী অপরাধ হিসাবে গণ্য। হিন্দু বিশিষ্টজনদের মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে জেলে নির্যাতন এমনকী ঘাতক দিয়ে হত্যা। হলো না তার কোনও বিচার, আমি অবরুদ্ধ পাকিস্তানে। একই ধারা অব্যাহত স্বাধীন বাংলাদেশে। শত্রু সম্পত্তি আইন বলবত রহিল। হাজার হাজার মন্দির ও হিন্দু জনগোষ্ঠীর সম্পত্তি দখল, ধ্বংস এবং অগ্নি সংযোগ নিয়মিত উৎসবে পরিণত হলো। হিন্দু নারী তাদের লালসার শিকার। ধর্মীয় গুরু ও পুরোহিতের মুণ্ডচ্ছেদ নতুন সংযোজন। নিরাপত্তা বিহীন ধর্মীয় উৎসব কল্পনার অতীত। শুধু আমার নতুন পরিচয় আমি পাকিস্তানি নয়, আমি বাংলাদেশি।

এদিকে পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে কোটি কোটি ছিন্নমূল শরণার্থীর ঢল এসে পড়াতে জনসংখ্যা বিন্যাসে ভারসাম্য হারালো, জমির চরিত্র বদল হতে লাগলো। ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠল অপরিকল্পিত ভাবে ঘিঞ্জি বস্তি, কলোনি। জন্মভূমির টান নাড়ীর বন্ধনে কলোনিগুলির নাম রাখা হলো খুলনা, ঢাকা পাবনা বার্মা কলোনি ইত্যাদি। এমন একজন শরণার্থীর কথা জানি যে রাতের অন্ধকারে সবকিছু মূল্যবান জিনিস ফেলে এসেছিল কিন্তু শুধু সঙ্গে এনেছিল এক কৌটা ভিটের মাটি, স্বপ্ন ছিল ভারত ভূমিতে নতুন বাড়ির ভিত পূজাতে ওই পবিত্র মাটি ছড়িয়ে দেবে। স্বাধীনতার ৬৫ বছর পরও তার জীবন দশায় একটা নিজস্ব ভিটে হয়নি। অতৃপ্ত একবুক কষ্ট নিয়ে ইহলোক ত্যাগ করেছেন।

আমাকে বলতে হয় আমার পরিচয় আমি এক ভারতীয়, আমি হলাম পাকিস্তানি আবার হলাম বাংলাদেশী সর্বশেষে আমার পরিচয় আমি একজন ভিটেমাটি হারা বিতাড়িত উদ্বাস্তু। রক্তে ও বিশ্বাসে ভারতীয়, অতীতেও ভারতীয়। এখনও ভারতীয় এবং ভবিষ্যতেও ভারতীয়। আমি চাই ভারতীয়দের সম নাগরিক অধিকার।

—চন্দন রায়,
পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা-১৬।

সমকাম ও বিবাহ-বহির্ভূত যৌন সম্পর্ক

সম্প্রতি সমকাম ও স্বামী ব্যতীত পরপুরুষের সঙ্গে নারীর যৌনাচার নিয়ে ব্রিটিশ সরকার প্রণীত প্রতিষ্ঠিত আইন বাতিল করে ভারতীয় সুপ্রিম কোর্টের বিশেষ বেঞ্চ কর্তৃক ঘোষণা করা হয়েছে। ফলে স্বভাবতই সমকামী ও অবৈধ যৌনাচারে লিপ্ত নারী-পুরুষগণ উৎফুল্ল হচ্ছেন। এবং বিতর্কের সূত্রপাত ঘটছে।

মহামান্য বিচারকমণ্ডলীর রায়ের প্রতি যথাযথ সম্মান জানিয়েও আমরা জনমত প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারে কিছু কথা বলছি— (১) সমকাম বিজ্ঞান স্বীকৃত একটি স্বাভাবিক ব্যাপার হলেও একথা সত্য যে, প্রকৃতির উদ্দেশ্য প্রজননের লক্ষ্যে তার কোনও ভূমিকা নেই। এবং সমাজে নিন্দনীয়ও। (২) বিবাহ-বহির্ভূত পরপুরুষের সঙ্গে বিবাহিতা নারীর যৌনাচার সমাজ ও আইনানুগ বিবাহের মতো খোলামেলা (পবিত্র না বললেও) বহুকাল ধরে প্রচলিত একটি অনুষ্ঠানকে অসম্মান করা হয়। এবং স্বামীর প্রতি তা শুধু বিশ্বাসঘাতকতাই নয়, তাঁর মানসিকপীড়ন, সংসার ভাঙার কারণ ও সুদূর প্রসারী সমস্যার সৃষ্টিকারীও বটে। ব্যক্তি স্বাধীনতার নামে এটা এটা উচ্ছৃঙ্খলতা ও সামাজিক অপরাধ। প্রতিটি মানুষ একেকটি একক। মানব ইতিহাসের প্রাথমিক পর্যায়ে সুসংবদ্ধ সমাজ প্রতিষ্ঠার আগে তার যত বাস্তব গুরুত্বই থাক, ক্রমে তা সমাজের গুরুত্বের কাছে লঘু হয়। প্রাধান্য পায়— ব্যক্তি মানুষ সমাজের (সমষ্টির) একটি ক্ষুদ্রতম অংশ। ব্যক্তিস্বাধীনতার দাবিকে অস্বীকার না করেও সমাজের শৃঙ্খলা ও সুস্থিতি বজায় রাখতে উপরোক্ত বিষয়টি সর্বোপরি বিবেচ্য হওয়া উচিত। মানবেতর প্রাণীদের মধ্যে ক্ষুদ্র পিঁপড়া, মৌমাছি হতে বৃহৎ হাতি পর্যন্ত সামাজিক শৃঙ্খলা মানে।

অতএব ব্যক্তিস্বাধীনতার নামে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সমকামিতা ও বিবাহবহির্ভূত যৌনসম্পর্ককে ঢালাওভাবে আইনি স্বীকৃতি দ্বারা সমাজকে অসম্মানিত, বিশৃঙ্খল ও সমস্যাকণ্টকিত না করে কীভাবে উভয়ের সমন্বয় করা যায় তা ভেবে দেখা দরকার। সংখ্যালঘুর (ধর্মীয় অর্থে নয়, মানবসমাজের প্রেক্ষিতে) জৈবিক অসুন্দর আবেগের চেয়ে সমাজের ভব্যতার গুরুত্ব অবশ্যই সমধিক এই সত্য স্বীকার করায় কল্যাণ আছে।

—কমলাকান্ত বণিক,
দত্তপুকুর, উত্তর ২৪ পরগনা।

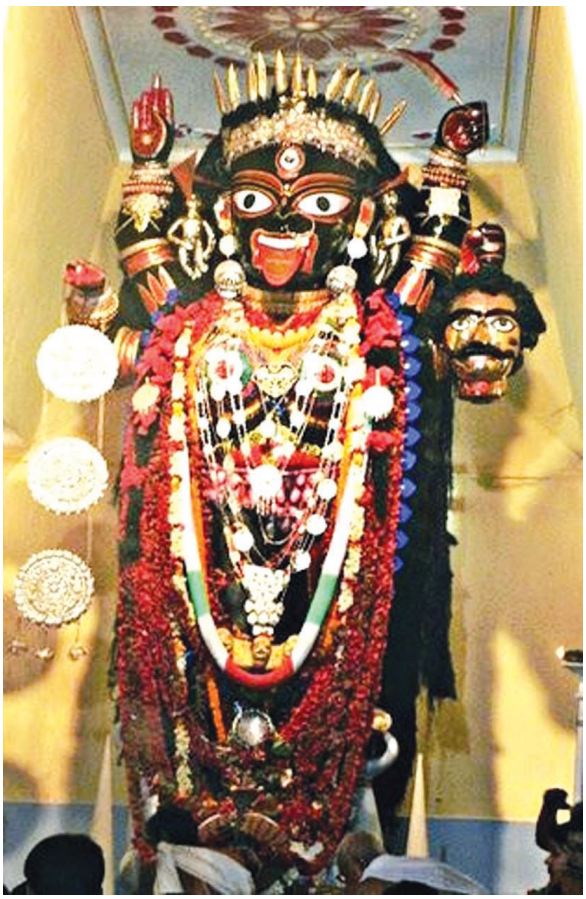

দক্ষিণা কালীমূর্তির রূপকার সাধক কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ

অরুণ মুখোপাধ্যায়

নবদ্বীপ শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান। সেই নবদ্বীপেই শাক্ত উপাসনা প্রথম শুরু করেছিলেন কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ। তাঁকে নিয়ে অনেক গল্প আছে।

তখন এই স্থান জঙ্গলে ঘেরা ছিল। ঘন অরণ্য। শুনশান স্তব্ধতা। ঝিঁঝির ডাক। শিয়ালের কান্না। এমন প্রায় ভৌতিক পরিবেশে এই পুণ্যক্ষেত্রে কৃষ্ণানন্দ মা কালীর সাধনায় মগ্ন হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি জানতেন না যে মা কালীর রূপ কেমন। ঘটে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে মায়ের পূজার্চনা করেন। কিন্তু মাতৃরূপটি কেমন তা হাজার চেষ্টা করেও কল্পনায় আনতে পারেন না। দুঃখ পান। ভাবেন, মায়ের পূজা আমি করছি ঠিকই, কিন্তু মায়ের অবয়বকে পাচ্ছি না কেন? কৃষ্ণানন্দ ধ্যানে মগ্ন থাকেন। চোখ বন্ধ। কল্পনায় এমন কিছুই ধরা পড়ছে না যাতে মাতৃমূর্তি চেনা যায়।

গভীর রাতে একদিন ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্ন দেখলেন। এক দেবীমূর্তি তাঁকে বলছেন, 'কাল ভোরে উঠে তুমি যাকে সর্বপ্রথম দেখতে পাবে তারই রূপ ও ভঙ্গিমায় তুমি আমাকে গঠন করবে।' ঘুম ভাঙল। রাত তখনও ফুরোয়নি। ভোর হলো। আলো ফুটল। কৃষ্ণানন্দ ঘর থেকে বাইরে বেরোলেন। দেখলেন এক শ্যামাঙ্গিনী গোপবধূ ডান পা সামনে বাড়িয়ে ঘুঁটে দেবার চেষ্টা করছেন। বধূর বাঁ হাতে গোবর। ডানহাতে ঘুঁটে দেবার ভঙ্গিমা। মাথা থেকে চুল এলিয়ে পড়েছে। আহা! একেই বোধ হয় এলোকেশী বলে। পরিশ্রমে ঘেমে গেছে গাল ও কপাল। কপালের ওপর ডান কাঁধ দিয়ে ঘাম মোছার ফলে কপালের সিঁদুরের টিপ ভুরু পর্যন্ত ছড়িয়ে গেছে।

কৃষ্ণানন্দ বধূটির দিকে তাকিয়ে থাকেন। বধূ সাধককে দেখতে পায়। ভোরের আলোয় এক পুরুষের দৃষ্টির সামনে পড়ে বধূ লজ্জায় জিভ কাটে। কৃষ্ণানন্দের মাতৃমূর্তি দর্শন হয়। অপার ভক্তির ওপর ভর করে সাধক তাঁর আরাধ্যা মায়ের মূর্তি কল্পনা করে ফেলেন। এই মূর্তি দক্ষিণাকালীর আদি রূপ। তন্ত্রোক্ত এই মূর্তির রূপকার সাধক কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ। তাঁরই হাতে মা কালীর পূজাপদ্ধতির সূচনা ও প্রসার হয়েছে বলে মনে করা হয়।

বৈষ্ণব তীর্থক্ষেত্র শ্রীচৈতন্যের জন্মস্থান নবদ্বীপে কৃষ্ণানন্দ ভট্টাচার্যের জন্ম। সময় জানা যায় না। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ না ষোড়শ শতাব্দীর সূচনায় কৃষ্ণানন্দের জন্মগ্রহণ? জানা নেই। সম্পূর্ণ ধোঁয়াশায় ঘেরা সময়ের বৃত্ত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে তাঁর জন্ম হয়েছিল বলে অনেক গবেষক মনে করেন। পিতা মহেশ্বর গৌড়াচার্য। ভট্টাচার্য ব্রাহ্মণ। কথিত যে, মহেশ্বরের কোনো পূর্বপুরুষ বিদ্যাচর্চার প্রয়োজন গৌড়দেশ থেকে নবদ্বীপে এসে বাসা বেঁধেছিলেন। তারপর থেকে গিয়েছিলেন। মহেশ্বরের দুই পুত্র অগ্রজ কৃষ্ণানন্দ, অনুজ মাধবানন্দ। মতান্তরে সহস্রাক্ষ। তন্ত্রশাস্ত্রে মহেশ্বরের আগ্রহ ছিল। সেই আগ্রহের রেশ কৃষ্ণানন্দে সঞ্চারিত হয়েছিল। আর শ্রীচৈতন্যের প্রেম প্রবাহে ভেসে গিয়েছিলেন মাধবানন্দ। একই পরিবারে দুই ভাই দুই ধারার সাধনায় নিজেদের নিয়োজিত রেখেছিলেন। শাক্তভাবে কৃষ্ণানন্দ ও বৈষ্ণবভাবে মাধবানন্দ ঈশ্বরের সন্ধানে ধ্যানে বসেছিলেন।

কৃষ্ণানন্দের উত্তরপুরুষ রামতোষণ বিদ্যালংকার ভট্টাচার্য 'প্রাণতোষণী' তন্ত্রের দ্বিতীয় কাণ্ডের শেষাংশে নিজের বংশ পরিচয় লিখেছেন, 'ধীমান শ্রীমান ভুবনবিদিতস্তন্ত্রসারস্য কর্তা/কৃষ্ণানন্দোঽজনি ভুবি নবদ্বীপ দেশ প্রদীপঃ'। নবদ্বীপ পুরাতত্ত্ব পরিষদ স্মারকগ্রন্থ, ২য় বর্ষ সংখ্যা '৯৮-এ যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী কৃষ্ণানন্দের জন্মসময় নিয়ে মতপার্থক্যের প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'তাঁর জন্ম সময় পঞ্চদশ শতকের শেষ ভাগ হতে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত অনুমান করা হয়েছে।'

শ্রীচৈতন্যদেব, রঘুনাথ শিরোমণি, রঘুনন্দন, কৃষ্ণানন্দ ভট্টাচার্য সহপাঠী ও সমসাময়িক ছিলেন বলে অনেকে মনে করেন। কারও মতে, এঁরা সবাই বাসুদেব সার্বভৌমের শিষ্য। তাহলে সেটা তো পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দী। যদি তাই হবে তাহলে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আমলে সভাকবি সাধক রামপ্রসাদের গুরু হিসেবে সাধক কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ মান্যতা পান কী করে? শ্রীচৈতন্যদেবের যুগ, বৈষ্ণব

ভাবান্দোলনের যুগ ও রামপ্রসাদের শাক্তগানের সময়ে যে দুশো বছরের ব্যবধান! কোথাও একটা ইতিহাসে ফাঁক থেকে যাচ্ছে। যা ভরাট করার দায়িত্ব নিয়েছেন কথকরা। মুখে মুখে নানা গল্পে অলৌকিকতাকে ছড়িয়ে দিয়েছেন যা একেবারেই ইতিহাসকে স্পর্শ করতে পারে না। একেই বোধহয় কালোত্তীর্ণ বলে।

'বৃহৎ তন্ত্রসারঃ' প্রণেতা মন্ত্রসিদ্ধ সাধক কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। সেই ক্ষমতার দুটি ঘটনা হলো— এক, কৃষ্ণানন্দ তাঁর পুত্রকে মন্ত্রোচ্চারণের ক্ষমতা বোঝাচ্ছেন। মন্ত্রের শক্তি কতটা, মন্ত্র কতটা অসাধ্য সাধন করতে পারে এমন সব কথা বলে যাচ্ছেন। মন্ত্র আবৃত্তি করলে যে কোনও দ্রব্য 'বজ্রদেহ' প্রাপ্ত হয় এবং সেই বস্তুকে আর ভেঙে দু' টুকরো করা যায় না। পুত্র পিতার কাছ থেকে মন্ত্রটি শুনলেন। আর তখনই সিদ্ধান্ত নিলেন, এই মন্ত্রের প্রয়োগ করে দেখাতে হবে। ভাবামাত্রই কাজ। অলৌকিক ক্ষমতা দেখাবার এমন সুবর্ণ সুযোগ কি কেউ হাতছাড়া করে? পুত্র সঙ্গে সঙ্গে বেশ কিছু লোক জড়ো করে একটি ফল এনে সামনে রাখলেন। সকলকে শুনিয়ে মন্ত্রোচ্চারণ করলেন। বললেন, এবার আর ফলটিকে কেটে দু' টুকরো করা যাবে না। যারা মন্ত্রের শক্তি দেখছিল ওদের মধ্যে থেকে একজন এগিয়ে এসে ফলের ওপর এক কোপ মারতেই ফলটি দু' টুকরো হয়ে গেল। কৃষ্ণানন্দের পুত্রের অলৌকিক ক্ষমতা দেখানোর প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেল। পুত্রের মুখ অপমানে রক্তবর্ণ হয়ে গেল। সব ব্যাপারটাই একটু দূরে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ লক্ষ্য করছিলেন। তিনি এগিয়ে এসে অন্য একটি ফলের ওপর একই মন্ত্র প্রয়োগ করলেন। তাঁর সাধক কণ্ঠে উচ্চারিত হলো মহামন্ত্র। হাজার চেষ্টা করেও তারপর ফলটিকে দু' টুকরো করা যায়নি।

সাধক কৃষ্ণানন্দ বোঝালেন, পুত্রের উচ্চারণে 'মন্ত্র' ছিল না। ওগুলো নিছকই 'শব্দ' উচ্চারণ ছিল। কিন্তু কৃষ্ণানন্দ সাধনার মাধ্যমে দীর্ঘদিনের তন্ত্রসাধনার অভ্যাসে 'শব্দ'কে 'মন্ত্রে' রূপান্তর ঘটিয়েছেন। ফলে 'শব্দ' উচ্চারণে 'মন্ত্র' কাজ করেনি। কিন্তু সাধকের উচ্চারণে 'মন্ত্র' ফল ঘটিয়েছে।

দ্বিতীয়টি, একদিন কৃষ্ণানন্দ বেশ কয়েকটি কলা এনেছেন। ভেবেছেন তাঁর ইষ্টদেবী আগমেশ্বরী কালীকে নিবেদন করবেন। স্নান সেরে পুজোয় বসবেন। স্নানে গেলেন। স্নানশেষে দেবীর কাছে এসে দেখলেন তাঁর আনা কলাগুলি নেই। তাঁর ভাই সেই কলাগুলি নিয়ে তাঁরই ইষ্টদেবতা কৃষ্ণকে নিবেদন করে ফেলেছেন। দুই ভাইয়ে তর্ক হলো। দুই ভাই তখন নিজ নিজ ইষ্টদেবতার মন্ত্র উচ্চারণ করলেন। সময় বয়ে যায়। মধ্যরাতে যখন চারদিক নিস্তব্ধ তখন এক জ্যোতির্বলয় দেখা গেল। দুই ভাই অবাক। সেই জ্যোতির মধ্যে দেখা গেল আদ্যাকালী মা তাঁর পুত্র বালগোপালকে কোলে বসিয়ে কলা খাওয়াচ্ছেন। দুই সাধকই বুঝলেন মা কালী আর গোপালে কোনো পার্থক্য নেই। অভেদ।

নবদ্বীপের আগমবাগীশ পাড়ায় আগমবাগীশ কালীবাড়িতে রয়েছে কৃষ্ণানন্দের প্রতিষ্ঠিত পঞ্চমুণ্ডীর আসন। মানুষ, শিয়াল, হনুমান, হাতি ও সাপের মুণ্ড রয়েছে পঞ্চমুণ্ডীতে। একটা সময় ছিল যখন দীপান্বিতা অমাবস্যাতেই কালীমূর্তি তৈরি হতো। রাতে পুজোর পর ভোরের আলো ফোটার আগেই বিসর্জিত হতো। সে সাধকের সময়। দিন রাতের মতো সময় বদলে যায়। আগমবাগীশের পুজোয়ও পরিবর্তন আসে। এখন কোজাগরী লক্ষ্মী পূর্ণিমার পর দ্বিতীয়ায় কাঠামোয় পাট পড়ে। পঞ্চমী থেকে একাদশী দেবীমূর্তি নির্মাণে নানা প্রক্রিয়া থাকে। পঞ্চমীতে দেড় হাত মাপের একটি ছোটো বাঁশকাঠিতে খড়, দড়ি ইত্যাদি দিয়ে একটি কালীমূর্তি তৈরি হয়। এটি প্রতীকী মূর্তি। পঞ্চমী থেকে ওই মূর্তির পুজো হয়। একাদশীতে দেবীর কাঠামোয় খড় জড়ানো হয়। আর ছোটো দেড় হাতের কালীমূর্তিটি মায়ের বুকের মধ্যে স্থাপন করা হয়। যাকে 'প্রাণপ্রতিষ্ঠা' বলে। একাদশীতে কাঠামোয় মাটি চাপে। রং লাগানো শুরু হয়। চতুর্দশীতে দেবী শরীরে মুণ্ড বসানো হয়। অমাবস্যা পড়লে চক্ষুদান। রাত ১২.৩০ থেকে ১টার মধ্যে মৃন্ময়ী প্রতিমার পুজো শুরু হয়। মা হয়ে ওঠেন চিন্ময়ী। কৃষ্ণানন্দ আগামবাগীশের কালী পুজোয় 'কারণ' থাকে না। বলিদান নেই। নিত্যপুজো হয়। প্রতি অমাবস্যায় অন্নভোগ। দীপান্বিতায় আরতি, ভোগ। পরদিন ১২৫ জন বেয়ারা চালে করে দেবী প্রতিমাকে নিয়ে স্থানীয় পিরতলায় মায়ের নিজস্ব পুকুরে বিসর্জন দেন।

সাধক কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের দৌহিত্র বংশের উত্তরপুরুষ প্রয়াত পরেশচন্দ্র সান্ন্যালের সহধর্মিণী রমা সান্ন্যাল ও তাঁদের কন্যা পূরবীর সঙ্গে কথা বলেই এইসব তথ্য জানা গেল। রমাদেবী ও পূরবীই বর্তমানে আগমবাগীশের কালীপুজোর মূল কর্মকর্তা। শুনলাম, কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ তাঁর প্রতিষ্ঠিতা কালী আগমেশ্বরীকে নিয়েই পঞ্চমুণ্ডীতে প্রবেশ করেছিলেন। বিশ্বাস, মা ও সাধক উভয়েই পঞ্চমুণ্ডীর নীচে রয়ে গেছেন।

শান্তিপুরে দেবী আগমেশ্বরী প্রতিষ্ঠার নেপথ্যে রয়েছে কৃষ্ণানন্দের অবদান। শান্তিপুরে আগমবাগীশের শ্বশুরালয় ছিল। একবার শ্বশুরবাড়িতে এসেছেন, অমাবস্যা পড়েছে। সাধক কী আর করেন? ওখানেই পঞ্চমুণ্ডীর আসন প্রতিষ্ঠা করে দেবী আগমেশ্বরীর পুজোয় বসে যান। সেখানেই চলছে আগমেশ্বরীর প্রাচীন পুজো।

অসম যখন অহোম রাজাদের অধীন, সেই সময় অহোম রাজারা হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেন। রাজা রুদ্রসিংহ শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হন কৃষ্ণানন্দ ভট্টাচার্যের কাছে। তিনিই কৃষ্ণানন্দকে বঙ্গদেশ থেকে অসমের কামাখ্যায় নিয়ে আসেন। রুদ্রসিংহের মৃত্যুর পর পুত্র শিবসিংহ রাজা হন। শিবসিংহ ও তাঁর স্ত্রী ফুলেশ্বরী দেবী প্রয়াত পিতার ইচ্ছানুসারে সাধক কৃষ্ণানন্দ ভট্টাচার্যের কাছে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হন। গুরুদক্ষিণাস্বরূপ রাজা কৃষ্ণানন্দকে ব্রহ্মোত্তর জমি দান করেন ও নীলাচল পর্বতে তাঁর বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দেন। সাধক কৃষ্ণানন্দ 'দুর্গাবচন মঞ্জরী' নামে দুর্গাপূজার বিধি সংগ্রহ করে বইটি লেখেন। এই বই কামাখ্যা মন্দিরে পঠিত হয়। এই বইয়েই রয়েছে কামাখ্যা মায়ের ও দুর্গামায়ের পুজোর নিয়ম। কেউ কেউ কামাখ্যায় যাওয়া কৃষ্ণানন্দের নামকে কৃষ্ণরাম ন্যায়বাগীশ লিখেছেন। ▮

অগ্নিযুগে বঙ্গদেশের কালী আরাধনা

রবি রঞ্জন সেন

আধুনিক যুগে দেশপ্রেম এবং জাতীয়তাবোধের দার্শনিক তত্ত্ব বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ উপন্যাসে উপস্থাপিত হয়। দেশকে মাতৃরূপে কল্পনা করা, জননী ও জন্মভূমিকে সমভাবে দেখা ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন ধারণা, কিন্তু বঙ্কিমের এই অমর সৃষ্টির মাধ্যমেই তা আধুনিক যুগের অনুকূল শব্দের মোড়কে সমসাময়িক এবং পরবর্তী প্রজন্মের কাছে এসে পৌঁছায়। আনন্দমঠে সত্যানন্দ ঠাকুর যখন মহেন্দ্রকে ভিন্নরূপে মাতৃদর্শন করাচ্ছেন, 'মা যা ছিলেন, মা যা হইয়াছেন' এবং 'মা যা হইবেন', জগদ্ধাত্রী, কালী ও দুর্গা রূপে আমরা হিমালয় থেকে সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত এই ভারতভূমিকে চিনতে পারি। ভবানন্দ যখন প্রথম বন্দে মাতরম্ গাইতে শুরু করেন তখন মহেন্দ্র একেবারেই বিস্মিত, কিছুই বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসা করলেন, ''মাতা কে?'' উত্তর না দিয়ে ভবানন্দ ''সুখদাং বরদাং মাতরম্' পর্যন্ত গাইবার পর মহেন্দ্র বলে উঠলেন, এতো দেশ, এতো মা নয়। মহেন্দ্রর এই বিস্ময় প্রকৃতপক্ষে সমসাময়িক পাঠকেরও বিস্ময়। কিন্তু ভবানন্দের উত্তর যেন তৎকালীন পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত আত্মভোলা বাঙ্গালি পাঠকের মনে চাবুকের ঘা-র মতো এসে পড়ে, ''আমরা অন্য মা মানি না--- জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। আমরা বলি, জন্মভূমিই জননী...।'' নরমুণ্ডমালিনী কালীমূর্তির মাধ্যমে 'মা যা হইয়াছেন'-এ বাঙ্গালি পাঠক তার নিজের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক দলন ও অপমানকে চিনতে শিখল— ''অন্ধকারসমাচ্ছন্না কালিমাময়ী। হৃতসর্বস্বা, এই জন্য নগ্নিকা। আজি দেশে সর্বত্রই শ্মশান— তাই মা কঙ্কালমালিনী। আপনার শিব আপনার পদতলে দলিতেছেন...।''

অবশ্য যুগ যুগ ধরেই ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামীরা পরাধীনতার শিকল ভাঙার শক্তি অর্জনের জন্য ব্রহ্মময়ী মায়েরই আরাধনা করেছেন। শিবাজী তুলজাপুরে অবস্থিত দেবী তুলজা ভবানীর আরাধনা করে মায়ের আশীর্বাদ-প্রাপ্ত হয়েছিলেন। গুরুগোবিন্দ সিংহও জ্বালামুখীতে দেবী চণ্ডীর আরাধনা করেন এবং কথিত হয় যে মা তাঁকে অষ্টভুজ অস্ত্র প্রদান করেছিলেন, যা আজও সযত্নে নান্দেড় হজুর সাহির গুরুদ্বারে রক্ষিত আছে। স্বদেশ ও স্বধর্ম রক্ষার্থে শক্তি লাভের জন্য শক্তির আরাধনা ছিল তাঁদের ব্রত।

১৮৮২-তে আনন্দমঠ প্রকাশের পর থেকেই বাঙ্গালি যুবসমাজের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগ্রত হতে থাকে। স্বামী বিবেকানন্দের আত্মশক্তি জাগরণের বাণী জাদুমন্ত্রের মতো যুবকদের উপর প্রভাব ফেলে। সাহস, শক্তি, বলিদান এবং মৃত্যুভয়কে তুচ্ছ করার ভাব তরুণ প্রজন্মের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। ১৮৯৮-এ রচিত স্বামীজীর কবিতা 'Kali the Mother' মা কালীর ভয়ঙ্কর রূপ এবং প্রকৃত ভক্তের জীবন-মৃত্যুর প্রতি উদাসীনতার ভাবকে তুলে ধরে। তার পরের বছরই প্রকাশিত হয় ভগিনী নিবেদিতার 'Kali the Mother' নামক পুস্তক যা শিক্ষিত বাঙ্গালির মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করে। মহেন্দ্রলাল সরকার-সমেত অনেক পাশ্চাত্য-শিক্ষিত বাঙ্গালি সেই সময় মনে করেন যে একজন বিদেশিনী এই বই লিখে বাঙ্গালির কুসংস্কারকেই আরও প্রোৎসাহিত করছেন, কারণ তাঁদের কাছে লৌকিক হিন্দুধর্ম কুসংস্কারেরই নামান্তর। তবে এই বইটি নতুন প্রজন্মের তরুণদের মধ্যে দেশীয় ধর্ম-সংস্কৃতি সম্বন্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি করে। নিবেদিতার সঙ্গে বরোদায় অরবিন্দ ঘোষের প্রথম সাক্ষাতের পূর্বেই আমরা জানতে পারি যে অরবিন্দ 'Kali the Mother' পড়েছিলেন এবং তার প্রশংসাও করেছিলেন।

বাংলায় এই সময়ে শক্তি জাগরণের অঙ্গ হিসেবে দিকে দিকে শরীরচর্চার আখড়া গড়ে ওঠে। এই আখড়াগুলিতে কুস্তি, লাঠিখেলা ছাড়াও তরোয়াল ও বন্দুক চালানোর শিক্ষা দেওয়া হয়। এরকমই এক আখড়া হিসেবে ১৯০২-তে অনুশীলন সমিতি শুরু হয়, যা পরবর্তীকালে সশস্ত্র স্বাধীনতা আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ১৯০৫-র বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের ফলে বাঙ্গালি তরুণদের মধ্যে দেশভক্তির ভাব আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়ে। এই সময়ে অরবিন্দের বিখ্যাত 'ভবানী মন্দির' পুস্তিকা ছাপা হয়। ভবানী মন্দির আদতে একটি মঠ ও মন্দির নির্মাণের রূপরেখা, যেখানে অরবিন্দ বলছেন যে এই মঠের সন্ন্যাসীরা অন্য সকল কর্ম পরিত্যাগ করে কেবলমাত্র দেশের জন্য কাজ করবে।

এই পুস্তিকার মাধ্যমে অরবিন্দ উপস্থিত করেছিলেন এক অনন্ত শক্তির ধারণা। কারণ তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, কেবলমাত্র শক্তির

জাগরণের মাধ্যমেই ভারতের পুনর্জাগরণ সম্ভব। উপনিষদ ও তন্ত্র দর্শনের সঙ্গে আনন্দমঠের সন্তানদলের ভাবাদর্শকে মিলিয়ে তিনি দেখিয়েছিলেন যে, মানবাত্মা সেই অনন্ত শক্তিরই অঙ্গ এবং সমস্ত দেশবাসীর এই সম্মিলিত শক্তির দ্বারা নির্মিত একটি বৃহৎ শক্তিই নামান্তরে দেশ। এই রাষ্ট্ররূপী বৃহৎ শক্তিই ব্রহ্মময়ী মা কালী এবং তাঁর সেবায় রত এই প্রস্তাবিত সন্ন্যাসী সম্প্রদায় মায়ের জন্যই বলিপ্রদত্ত। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত না হলেও তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার এই পুস্তিকাকে যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করেছিল। 'Political Trouble in India 1907-17' নামক প্রতিবেদনে জে. সি. কের এটিকে 'the gern of the Hindu revolutionary Movement in Bengal' বলে উল্লেখ করেছেন। কুখ্যাত রাউলাট প্রতিবেদনেও এটিকে 'of a mischievous or specially inflammatory kind' বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

মে ১৯০৭-এ কলকাতায় একটি ভাষণে অরবিন্দ এই শক্তি জাগরণের উদ্দেশ্যে গ্রামেগঞ্জে সর্বত্র কালীপূজা আয়োজন করার আহ্বান করেন। তিনি বলেন যে, এই পূজা সাধারণ কালীপূজা নয়, বরং রক্ষাকালী পূজা হওয়া উচিত যা এই দেশের মানুষ বরাবরই মড়ক বা অন্য কোনও সংকটকালে করে এসেছে। তিনি আরও বলেন যে, রক্ষাকালী সবরকম অনিষ্ট থেকে রক্ষা করেন। তিনি কালো নন বরং শুভ্রবর্ণ। অন্ধকারের নন আলোর প্রতীক। আর এই রক্ষাকালী শ্বেতবর্ণ ছাগ বলি গ্রহণ করেন। তিনি বলেন যে, এই পূজা দেশবাসীর নিরাশ চিত্তে সাহসের সঞ্চার করবে।

এই উদ্দেশ্যে সেই যুগের বিপ্লবীরা বিভিন্ন স্থানে কালীপূজা ও দুর্গাপূজার আয়োজন করতেন। অনুশীলন সমিতির উদ্যোগে দুর্গা পূজা আয়োজিত হয়েছিল। কুমিল্লার বিপ্লবী যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর আত্মকথায় উল্লেখ করেছেন যে গ্রেপ্তারের পরে তাঁরা রাজশাহী জেলের অভ্যন্তরেও দুর্গাপূজার আয়োজন করেছিলেন। তাঁরা মাতৃরূপে আসলে দেশকেই কল্পনা করেছিলেন, দেশের কাজে আত্মনিয়োগ এবং প্রয়োজনে মৃত্যুবরণকে তাঁরা মাতৃপূজায় আত্মবলিদান মনে করতেন। বিপ্লবী পত্রিকা 'যুগান্তর'-এর প্রতীকচিহ্ন ছিল তরোয়াল ও ত্রিশূল। যুগান্তরে প্রকাশিত লেখায় বলা হচ্ছে, ''ওই যাহারা নৃমুণ্ডমালিনীর খর্পরতলে আত্মবলিদান দিয়া অমরত্বলাভের জন্য উৎসুক— তাহারাই দেশে যুগান্তর আনিবে।'' আর একটি লেখার পাঠককে অনুরোধ করা হচ্ছে, ''একবার চোখের ঠুলি খুলিয়া ফেলিয়া মায়ের অভয়পদ দেখ দেখি, বুঝিতে পারিবে এ ইংরেজ রাজত্ব একটা প্রকাণ্ড মিথ্যা মায়াপুরী।'' তাই বাংলার বিপ্লবীরা যখন প্রথম হাতবোমার ব্যবহার শিখলেন, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় সান্ধ্য পত্রিকার সম্পাদকীয়তে সহাস্যে এই নতুন ধরনের বোমাকে আখ্যা দেন 'কালী মাঈর বোমা'!

অনুশীলন সমিতির নতুন সদস্যদের দীক্ষা হতো মা কালীর সম্মুখে— ''সংযম উপবাস হবিষ্যান্ন গ্রহণ করিয়া শুদ্ধচিত্তে কালীমূর্তির নিকট আলীঢ়াসনে বসিয়া মস্তকে গীতা ও অসি ধারণ করিয়া'' তাঁদের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে হতো। ঢাকা অনুশীলন সমিতির নেতা বিখ্যাত বিপ্লবী পুলিন বিহারী দাস রুদ্রাক্ষের মালা গলায় ও হাতে পরিধান করে, কপালে ত্রিশূল চিহ্ন এঁকে নিজের ও দীক্ষার্থীর কপালে রক্তচন্দনের তিলক অঙ্কন করে যজ্ঞে বসতেন। যজ্ঞস্থলে তামা তুলসী গীতা গঙ্গাজল ও তরবারি রক্ষিত থাকত। শিক্ষার্থী এই সমস্ত স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতেন। ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য সমস্তরকম ব্যক্তিসুখ ত্যাগ করার সংকল্প গ্রহণ করে অসিকে প্রণাম করে আদ্যাশক্তির নামে তা হাতে তুলে নিতে হতো।

ব্রিটিশ সরকারের প্রতিবেদনে বৈপ্লবিক গ্রন্থের তালিকায় গীতা ও চণ্ডীর উল্লেখ পাওয়া যায়। তারা জানতেন যে, এই ধর্মগ্রন্থগুলি বিপ্লবীদের অনুপ্রেরণার উৎস। জে. সি. কের তাঁর প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছেন যে, অসুরনিধনের রূপক বিপ্লবীদের বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল, কারণ বিপ্লবী সাহিত্যে ইংরেজদেরই অসুর বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিপ্লবীদের দ্বারা গীত স্বদেশী গানগুলির মধ্যেও আমরা মা কালীর প্রতি সন্তানের প্রার্থনা পাই। কয়েকটি বিচ্ছিন্ন গানের পংক্তি এইরকম :

'আজি মাগো খুলে রাখো মণিময় হার
গলে পর নরমুণ্ডমালা';
'দণ্ড দিতে চণ্ডমুণ্ডে এসো চণ্ডী যুগান্তরে';
'শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত মোরা অভয়াচরণে নম্রশির...
শত্রুরক্তে মায়ের তর্পণ, জবার বদলে ছিন্ন শির'

বিপ্লবী যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, ''কোনও ডাকাতি করিবার পূর্বে আমরা কালীপূজা করিতাম এবং আমাদের জীবনের যে প্রধান ব্রত ছিল বিদেশির অধীনতাপাশ ছিন্ন করিয়া মাতৃভূমিকে স্বাধীন করা, তাহা পালন করিবার উদ্দেশ্যে এই পবিত্র কর্তব্য যাহাতে সুসম্পন্ন হয় তাহার জন্য মায়ের আশীর্বাদ হিসাবে মায়ের প্রসাদ ও আশীর্বাদী ফুল সঙ্গে রাখিতাম। এই সকল ধর্মানুষ্ঠান ও অন্তরের গভীর বিশ্বাসের ফলেই আমরা নির্ভীক ও মহান উদ্দেশে আত্মোৎসর্গের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিয়াছিলাম।'' ফাঁসির পূর্বে ক্ষুদিরামের অন্তিম বাসনা ছিল মা কালীর চরণামৃত। আর কানাইলাল দত্তের ফাঁসির পর কালীমন্দিরের জন্য নির্দিষ্ট ফুল, বেলপাতা শোকযাত্রার সময়ে শোকার্ত জনগণ তাঁর মৃতদেহের উপর ছড়িয়ে দিয়েছিল।

অগ্নিযুগের সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ধর্ম ও সংস্কৃতি সচেতন এই জাতীয়তাবোধকে পরবর্তীকালে অনেকে সমালোচনা করেছেন। জওহরলাল নেহরুর মতে এই যুগের জাতীয়তাবাদ তার ধর্মকেন্দ্রিকতার জন্য প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে উঠেছিল। এ বিষয়ে তিনি বলেছেন, ''Socially speaking, the revival of Indian nationalism in 1907 was definitely reactionary. Inevitably, a new nationalism in India, as elsewhere in the East, was a religious nationalism.''

উল্লেখ্য, ১৯২০-র পর ভারতীয় জাতীয়তাবোধের স্রোতে 'সেকুলারিজ্‌ম্' নামক আমদানি করা তত্ত্বের মিশ্রণের ফলে মতাদর্শগত বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। এই বিভ্রান্তির পরিণাম স্বরূপ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির নামে জাতীয়তাবোধের সঙ্গে আপোশ এবং অবশেষে দেশভাগ ও গণহত্যার যন্ত্রণাদায়ক কাহিনি। অপরদিকে, যুগ যুগ ধরে প্রবাহিত প্রকৃত ভারতীয় জাতীয়তাবোধ সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক চেতনা সম্পৃক্ত। অগ্নিযুগের সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মাতৃ আরাধনা এবং আত্মত্যাগ এ দেশের শাশ্বত এবং সংস্কৃতি-সমৃদ্ধ জাতীয়তাবোধেরই পরিচায়ক।

নিবেদিতার কালী সাধনা ভারতীয় ঐতিহ্য ও পৌরুষের সাধনা

পুলকনারায়ণ ধর

ভারতের ইতিহাসে যে সকল বিদেশি দেশের জন্য কাজ করেছেন তাঁদের মধ্যে নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ অবদান ভগিনী নিবেদিতার। যাঁকে 'ভারতকন্যা' বলেও অভিহিত করা যায়। তিনি নিজেকে যেভাবে ভারতের জন্য উৎসর্গ করেছেন তার কোনও তুলনা আমরা পাই না। তিনি দেশের জন্য নিজেকে সম্পূর্ণ উৎসর্গ করেছেন। নিজের জন্য কিছুই রাখেননি। আদ্যন্ত আধ্যাত্মিক মননের ব্যক্তিত্ব নিবেদিতা তাঁর ভারত আগমনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলেছিলেন কলকাতার স্টার থিয়েটারে তাঁর প্রথম বক্তৃতায়। ১১ মার্চ ১৮৯৮ সালে ‘‘আপনারা এমন এক রক্ষণশীল জাতি, যে জাতি দীর্ঘদিন ধরিয়া সমগ্র জগতের জন্য শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক সম্পদ সযত্নে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। আর ঐ কারণেই সেবার জ্বলন্ত আকাঙ্ক্ষা লইয়া ভারতকে সেবা করিবার জন্যই আমার এদেশে আগমন।’’ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন, ‘‘ভারতবর্ষকে বিদেশি যাঁরা সত্যিই ভালোবেসেছিলেন তার মধ্যে নিবেদিতার স্থান সবচেয়ে বড়।’’

নিবেদিতা নিজেকে সর্বদা রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের নিবেদিতা বলেই উল্লেখ করতেন। নিজেকে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের নামের সঙ্গে যুক্ত করার উদ্দেশ্য কিন্তু আত্মপ্রচারের সোপানে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করা নয়। রামকৃষ্ণকে তিনি দেখেননি। কিন্তু তিনি তাঁকে পেয়েছেন ও উপলব্ধি করেছেন স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীসারদামায়ের মাধ্যমে। উপলব্ধি করেছেন স্বামীজীর শিক্ষা থেকে। স্বামীজী নিবেদিতাকে গড়েছিলেন ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক উপাদানে---মাতৃসাধনায়। ইংরেজি শিক্ষিত বাঙ্গালি যুবকরা প্রাচীন হিন্দুদের কীর্তিকলাপ ও ধর্মে ইতিবাচক কোনওকিছুই দেখতে পেতেন না। তারা পাশ্চাত্যের মোহে হিন্দুদের ধর্ম, দর্শন ও ব্যবহারকে নিন্দা করতেই অভ্যস্ত হলেন। তারা গর্বের সঙ্গে খ্রিস্টধর্মকে গ্রহণ করতে

আগ্রহী হলেন। আবার ব্রাহ্মসমাজকেও অনেকে বিকল্প আশ্রয় হিসাবে গ্রহণ করেন। কিন্তু এর বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া শুরু হয় ১৮৭০-৮০ দশকের প্রথমে। —''হিন্দু ধর্ম ও আচার ধর্মের পক্ষে যুক্তিতর্ক করিবার বহু লোকের আবির্ভাব হইল... দেখা দিল আক্রমণশীল হিন্দুধর্ম (অ্যাগ্রেসিভ হিন্দুইজম)। শিক্ষিত হিন্দুর ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হওয়াও বন্ধ হইল।'' (যদুনাথ সরকার)। নিবেদিতা যে আন্দোলনকে 'অ্যাগ্রেসিভ' বলছেন আচার্য যদুনাথ সরকার তাকেই বলেছেন 'অ্যাকটিভ হিন্দুইজম'। এই 'অ্যাগ্রেসিভ' বা 'অ্যাকটিভ হিন্দুইজম'-ই ছিল নিবেদিতার 'কালী' উপাসনার কারণ। স্বামীজী নিবেদিতাকে 'কালী' ভাবনায় বা সাধনায় উদ্বুদ্ধ করেছেন। স্বামীজীর স্পষ্ট উপলব্ধি ছিল, তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন 'কালী'। রামকৃষ্ণের তিরোধানের অব্যবহিত পরে শ্রীসারদা মায়ের আর্ত জিজ্ঞাসা ''আমার কালী কোথায় গেল?'' রামকৃষ্ণ ও শ্রীসারদামাকে ইয়ত্তা করা দু-একজন ছাড়া কারও পক্ষেই সম্ভব হয়নি। এই দু-একজনের মধ্যে ছিলেন নিবেদিতা। তিনি রামকৃষ্ণকে উপলব্ধি করেছিলেন শক্তিসাধক হিসেবে। কালীকে রামকৃষ্ণ প্রেমভক্তি ও শক্তির আধার হিসেবেই সাধনা করেছেন। স্বামীজীর মধ্যেও নিবেদিতা এই ভাবকেই লক্ষ্য করেছেন। নিবেদিতার সমগ্র জীবন ও কর্ম যদি যথার্থ অনুধ্যান করা যায়, তবে তাঁর মধ্যে আমরা দেখব প্রেম-ভালোবাসার প্রতিমূর্তি। তাঁর মধ্যে আমরা পাব জ্বলন্ত দেশপ্রেমের অনির্বাণ প্রকাশ। অর্থাৎ শক্তির প্রকাশ। কালীর প্রকাশ। তাঁর তেজদীপ্তি ও রুদ্রের প্রকাশ, কালীর শক্তির বিচ্ছুরণ। এই শক্তির প্রকাশই দেশ প্রত্যক্ষ করেছিল তাঁর জাতীয়তাবাদী ভাবনায়।

স্বামীজী চেয়েছিলেন বিদেশি শাসনমুক্ত ভারত। নিবেদিতাও সেই কারণেই জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন স্বামীজীর তিরোধানের পর। ভারত মুক্তির এই আন্দোলন ছিল ভারতবাসীর শক্তির সাধনা। নিবেদিতা বুঝেছিলেন, ভারতীয় যুবকদের আত্মপ্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ করতে প্রয়োজন শক্তির সাধনা। স্বামীজী যুব সমাজকে গীতাপাঠ ছেড়ে ফুটবল খেলার যে আহ্বান করেছিলেন, তা প্রকৃতই ছিল শক্তি সাধনারই আহ্বান। নিবেদিতার 'কালী' ভাবনা বা আরাধনাও শক্তিরই আরাধনা, যে শক্তি মৃত্যুকেও বরণ করতে বা ভালবাসতে শেখায়।

স্বামীজী বারবার বলেছেন, "I worship the Terrible.... Let us worship the Terror for its own sake"। কালীর কাছে পশুবলি প্রসঙ্গে স্বামীজীকে নিবেদিতা তাঁর সংশয়ের কথা জানালে স্বামীজী কোনও যুক্তিতর্কের অবতারণা না করে সামান্য কথায় বলেছিলেন, "Why not a little blood, to complete the picture?" —স্বামীজী যদি রাজনীতির ব্যক্তি হতেন তাহলে হয়তো জাতীয় স্বাধীনতার জন্য এই 'a little blood'-এর বিরোধিতা করতেন না। এটা অবশ্য অন্য প্রসঙ্গ এবং অনুমান মাত্র। এ বিষয়ে স্বামীজী কোনও ব্যাখ্যা দেননি এবং সেই ব্যাখ্যার অনুসন্ধান বাতুলতার সমান। তবে মূল বিষয় অর্থাৎ বিরাট শক্তির প্রসঙ্গ ছেড়ে ছোট বিষয় নিয়ে কূটকচালি স্বামীজী করেননি। কোনও জাতি শক্তি সাধনা ব্যতীত আত্মসম্মান ও স্বাধীনতা লাভ করতে পারে না— স্বামীজীর এই বিশ্বাস নিবেদিতার অন্তরে চির জাগরুক ছিল। তাঁর সকল কাজে সকল ভাবনার মূলেই ছিল এই আধ্যাত্মিক শক্তি সাধনা তথা 'কালী' সাধনা। নিবেদিতার কাজকে যাঁরা খণ্ডখণ্ড করে বিচার করেন তাঁরা তাঁর সকল কর্মের ও জীবনের আধ্যাত্মিক বীজটিকেই উপেক্ষা করেন। নিবেদিতার কালী ভাবনাকে তাই আমাদের ফিরে ফিরেই বিচার করা প্রয়োজন। রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের নিবেদিতাকে আমরা তাঁর 'কালী' ভাবনায় সম্পূর্ণরূপে পাই।

গবেষক শঙ্করীপ্রসাদ বসু যথার্থ বলেছেন, ''নিবেদিতার নিকট কালী কেবল একটি ধর্মীয় বা দার্শনিক সত্যই নয়, তাঁর পরবর্তী সর্বকর্ম ক্রিয়াত্মিকা শক্তি। তা আমরা দেখতে পাই তাঁর সেবার মধ্যে, রাজনীতির মধ্যে, এক কথায় আত্মোৎসর্গের মধ্যে। মহাকালীর এক নন্দিনীর নাম নিবেদিতা'' (নিবেদিতা লোকমাতা, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২৭৩)। রামকৃষ্ণের নিবেদিতা বিবেকানন্দের নিবেদিতার জীবনেও কালীই প্রধান। কারণ রামকৃষ্ণের সাধনার প্রথম সিদ্ধি কালী দর্শনে। তাঁর শেষ উচ্চারিত শব্দ 'কালী'। বিবেকানন্দের এই 'কালী' বিশ্বাস এসেছে অনেক তর্ক-বিতর্কের পর। ব্রাহ্ম ধর্ম ও বিজ্ঞানের আস্তরণ ভেদ করে রামকৃষ্ণের 'কালী'কে তিনি যখন মেনে নিলেন এবং গুরুর কাছে সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন করলেন সেদিনই ঠাকুরকে বুঝতে পারলেন। তাঁর ভক্তি ও ভালোবাসা রূপান্তরিত হলো সম্পূর্ণ বিশ্বাসে। তিনিও তাঁর গুরুর মতন হলেন কালীভক্ত। নিবেদিতাকে সঙ্গে নিয়ে স্বামীজী গিয়েছিলেন হিমালয় যাত্রায়। নিবেদিতা উপলব্ধি করেন ত্যাগ ও বৈরাগ্যই ধর্ম। শিব এই সত্যেরই প্রতীক। পাশ্চাত্য কেবল সুখের পূজা করে। তা কখনই মহৎ হতে পারে না। নিবেদিতার উপলব্ধি, আমাদের পূজা সুখেরও নয় দুঃখেরও নয়। সুখ দুঃখের তরঙ্গই আমাদের জীবন। শিব ও কালী এই পরম সত্যের প্রতীক। এই সত্যকেই রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ চাক্ষুষ করেছেন। চাক্ষুষ করেছেন ভারতের ঋষিরা। কিন্তু ব্রাহ্ম ও ইঙ্গ-বঙ্গরা এসব নিয়ে হাসিঠাট্টা করত খ্রিস্টান মিশনারিদের সঙ্গে গলাগলি হয়ে। যা কিছু ভারতীয় ঐতিহ্য তাই এদের কাছে ছিল বিদ্রূপ ও অবিশ্বাসের ব্যাপার। সেটাই সে যুগের আধুনিকতার চিহ্ন বলে অনেকের কাছে বিবেচিত হতো। বিবেকানন্দ বা রামকৃষ্ণকে হয়তো মেনে নেওয়া তাদের অনেকের কাছেই অসম্ভব হতো না, যদি তাঁরা ওই 'বীভৎস' মূর্তিপূজার সাধক না হতেন। এই বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বিরূপ সমালোচনার জবাব দেবার জন্যই বিবেকানন্দ স্থির করলেন নিবেদিতাকে দিয়ে 'কালী' বক্তৃতা প্রদান করাবেন।

নিবেদিতা কলকাতার অ্যালবার্ট হলে (আজকের কলেজ স্ট্রিটের কফি হাউস) 'কালী ও কালীপূজা' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৯ সালে। শ্রোতাপূর্ণ হলে সেদিন উপস্থিত ছিলেন ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার, ডাঃ নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীমতী সরলা ঘোষাল (সরলাদেবী চৌধুরাণী), শ্রীমতী সালজার প্রমুখ। একজন ইংরেজ মহিলা 'কালী' প্রসঙ্গে বক্তৃতা দেবেন এটা ছিল বিরাট কৌতূহলের বিষয়। সভাপতি পদ অলঙ্কৃত করার জন্য বিশিষ্ট কোনও ব্যক্তিকে সম্মত করা যায়নি। সভাপতি একজন ছিলেন বটে কিন্তু তিনি তেমন 'মান্য' ব্যক্তি ছিলেন না। বক্তৃতাসভায় ডাঃ

মহেন্দ্রলাল সরকার নিবেদিতার বক্তৃতার তীব্র আপত্তি করেছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, 'কালী' একটি কুসংস্কার প্রসূত ধারণা। দেশ থেকে 'যুক্তিবাদী'রা যখন কুসংস্কার দূর করার চেষ্টা করছেন তখন তাতে বাতাস দেওয়া হচ্ছে। এই বক্তব্য ছিল ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের। এটাই যদি 'যুক্তি' হয় তবে সমাজ থেকে সব পূজা-পার্বণই ঝেটিয়ে বিদায় করতে হয়। যাই হোক ডাঃ সরকারের এই বক্তব্যে সভায় তুমুল হৈহট্টগোল শুরু হয় যা স্বয়ং নিবেদিতাকেই স্তিমিত করতে হয়। সে যুগের কাগজপত্রও নিবেদিতার বক্তৃতার বিষয় এড়িয়েই গিয়েছিল। নিবেদিতা আঘাত করেছিলেন খ্রিস্টান মিশনারি প্রচারক ও তাদের ভাবুককে যারা ভারতের যা কিছু প্রাচীন তাকেই আক্রমণ করে প্রচার করছিল ভারতীয়রা একটি 'অসভ্য' জাতি। তাদের মধ্যে ইংরেজ একটা হীনম্মন্যতার ভাব প্রবেশ করিয়ে দিচ্ছিল। নিবেদিতার কালী-বক্তৃতা এরই প্রতিবাদ। তাঁর 'কালী' তথা 'শক্তি' পূজা এরই বিপরীত প্রবাহ সৃষ্টি করতে চেয়েছিল।

নিবেদিতা 'কালী'কে কীভাবে বিচার করেছেন? কেনই বা তিনি 'কালী' সম্বন্ধে বলতে গেলেন এ প্রশ্ন স্বাভাবিক। তাঁর বক্তৃতার প্রারম্ভে নিবেদিতা এই বক্তৃতা দেবার অধিকার সম্বন্ধে বলেছেন--- ''বাল্যকালে যে কথা আমি শুনেছি, তা অর্ধ সত্য, পূর্ণ সত্য নয়, এবং পূর্ণসত্যের সন্ধানই আমাদের ব্রত হওয়া উচিত। ...একজন ইংরেজ রমণীরূপে ক্ষমা প্রার্থনা করবার অধিকারও আমার আছে; আমার দেশের নর-নারী অন্য একটি দেশের মানুষের— সমতুল মানুষের প্রাণপ্রিয় ধর্মবিশ্বাসের কুৎসা করে যে অন্যায় করেছে, তার জন্য প্রকাশ্য ক্ষমা আমি চাইতে পারি... শেষ কথা, সদ্যলব্ধ কোনো ধারণাকে প্রকাশের অধিকারও আমার আছে।" নিবেদিতা মাতৃরূপিণী ঈশ্বরের তিনটি রূপের উল্লেখ করেছেন— দুর্গা, জগদ্ধাত্রী ও কালী। দুর্গার মধ্যে রাজ্ঞীভাব। তিনি সৃষ্টির কেন্দ্রীয় প্রাণচেতনা। জগদ্ধাত্রীর মধ্যে রক্ষয়িণীভাবের বিকাশ। কালী ভয়ঙ্করী, অগ্নি-রসনা। মৃত্যু শ্মশান। আত্মা যেখানে নীরব। কালী পরম শব্দ 'মাতা'।

কালী কঠিন সত্যকে গ্রহণ করবার শক্তি দেয়। দক্ষিণ হস্তে আশীর্বাদ ও বামহস্তে মৃত্যু। বিবেকানন্দের 'Kali the Mother' কবিতাটির ভাবার্থই নিবেদিতার বক্তৃতার বিষয়। যিনি জীবনদাত্রী তিনিই নিহন্তা। এটি একটি কালাতীত 'Phenomenon'। ঈশ্বর নিত্য। মহাকালের রহস্য দুর্জ্ঞেয়। মহাকাল নিকষ কালো আঁধারে আবৃত। শ্মশানই একমাত্র স্থান যেখানে মানুষ সমস্ত কিছু বিসর্জন দিয়ে উচ্চারণ করতে পারে মায়ের নাম। নিবেদিতার বিচারে মাতৃ উপাসনা তথা কালী উপাসনা পৌরুষেরই উদ্বোধন। তাঁর কথায় ''যুগে যুগে কালী ভারতকে মানুষ দিয়েছেন। প্রতাপ সিংহ, শিবাজী, শিখেরা— এঁদের দিয়েছেন তিনি।... মাতৃপূজা ত্যাগ করে, তাহলে নিজ পৌরুষকেই ত্যাগ করবে। প্রাচীন পূজাকে দশগুণ বেশি ভক্তির সঙ্গে গ্রহণ করতে হবে, না করলে এদেশের চিরদুর্দশা ও অপমান।" নিবেদিতার এই 'কালীশক্তি' জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অনুপ্রেরণা ছিল। স্বামীজী বলেছিলেন সগুণ ঈশ্বর হলেন সকল আত্মার সমষ্টি, কেবল মানবাত্মার সমষ্টি নয়। সেই সমষ্টিভূত বিরাটের অভিপ্রায়কে কেউ রোধ করতে সমর্থ নয়। তারই নাম নিয়তি। শিব, কালী প্রভৃতি বলতে আমরা তাকেই বুঝি। নিবেদিতা স্বামীজীর কাছে শুনেছিলেন সেই বাণী : 'পূজা করো ভয়ঙ্করের! পূজা করো মৃত্যুর! আর সব বৃথা— বৃথা সকল সংগ্রাম! এই শেষ শিক্ষা। তাই বলে কাপুরুষের মৃত্যুকামনা নয়, দুর্বলের আত্মঘাত নয়। এ হলো বীরের অভ্যর্থনা— ''মৃত্যুক সব কিছুকে যে শেষ পর্যন্ত যাচিয়ে দেখেছে, জেনেছে --- এই শেষ উপায়!"

হিন্দুর ভাবধারা ও অন্তর নিবেদিতা যে ভাবে অনুভব করেছিলেন তাঁর 'কালী' ভাবনা তারই প্রতিফলন। আপাতদৃষ্টিতে হিন্দুরা সর্বাপেক্ষা পৌত্তলিক। কিন্তু তারাই 'প্রতীক' পূজার স্তর থেকে বিশুদ্ধভাবের পথ ধরে সৃষ্টি রহস্য সমাধানে ব্যাপৃত হয়। বাহ্যবস্তু হিন্দুর অবলম্বন মাত্র। কালীমূর্তি বাহ্য হলেও কালীভাবনা তার প্রকৃত আত্মা। ভাব এবং মূর্তি হিন্দুর কাছে প্রায় একাকার হয়ে যায়।

অ্যালবার্ট হলের বক্তৃতার পর নিবেদিতার কাছে কালীঘাট মন্দিরে বক্তৃতা করার অনুরোধ আসে। ২৮ মে কালীঘাট মন্দিরে বক্তৃতা হয়। অ্যালবার্ট হলে কালী বক্তৃতা প্রসঙ্গে যে প্রতিবাদের যুক্তি উত্থাপিত হয়েছিল কালীঘাট মন্দিরে বক্তৃতায় নিবেদিতা তা খণ্ডন করেন। এই প্রতিবাদী যুক্তিরই অন্যতম ছিল 'মূর্তি' পূজা। এ সম্বন্ধে নিবেদিতার বক্তব্য ও ব্যাখ্যা আমরা জেনেছি। কালীঘাটের মন্দিরেও নিবেদিতা বললেন— ''কোনও প্রতীক অবলম্বনে মনকে তন্ময় করিবার ইহা একটি উপায় মাত্র। প্রকৃত পূজা প্রতিমার সম্মুখে অবস্থিত জলপূর্ণ কুম্ভের উপর অনুষ্ঠিত হয়; এবং ওই পূর্ণকুম্ভটিকে সেই অনন্ত শক্তির প্রতীকরূপে কল্পনা করা হইয়া থাকে।" কালীমূর্তির কল্পনা এবং শিল্পকলা প্রসঙ্গেও নিবেদিতার বক্তব্য ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট ও ভারতীয় শিল্পচেতনা সমৃদ্ধ। তাঁর বিচারে ইউরোপীয় ভাস্কর্য এবং শিল্পের দৃষ্টিতেও কালীমূর্তির বিশিষ্ট নাটকীয় ভঙ্গি অপূর্ব। —''কালীমূর্তির মধ্যে শিল্পের গভীর তাৎপর্য সন্ধানী দৃষ্টির নিকটেও সুস্পষ্ট এবং বিস্ময়কর।" বলিদান-প্রথার প্রসঙ্গে নিবেদিতার বক্তব্য উল্লেখ করেন প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা। নিবেদিতার ব্যাখ্যা প্রকৃত কালীপূজায় অন্যকে উৎসর্গ করার পরিবর্তে আত্মোৎসর্গের বিধান আছে। এই আত্মোৎসর্গই পূজার শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য, এবং ইহার মধ্যেই সাধকের শক্তিলাভের সমগ্র রহস্য নিহিত। শক্তির উদ্ভব ত্যাগে। ত্যাগের উত্তরোত্তর উৎকর্ষ ব্যতীত শক্তিপূজার অনুষ্ঠান যথাযথ সম্পন্ন হয় না।, প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণার মতে ''ভারতের জাতীয়তার উদ্বোধনরাগিনী নিবেদিতার কণ্ঠে সেদিন এই বক্তৃতার মধ্য দিয়াই ধ্বনিত হইয়াছিল"। (ভগিনী নিবেদিতা, পৃ. ১৩৬)

সকলের জন্য এমন ভাবে তিনি 'কালীর' ব্যাখ্যা করেছেন যে একটি শিশুও তা গল্পের আকারে গ্রহণ করতে পারে। মিসেস লেগেটের শিশু কন্যার উদ্দেশে নিবেদিতা মা-কালী সম্বন্ধে গল্প রচনা করেন। নিবেদিতা লিখেছেন— ''খুকুমণি, ছেলেবেলার সবচেয়ে আগেকার কোন্ কথাটি তোমার মনে পড়ে বলত? মায়ের কোলে শুয়ে, তাঁর মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে হাসতে— সেই কথাটি নয় কি?

''মায়ের সঙ্গে খুকুর লুকোচুরি খেলা। মা যেই চোখ বন্ধ করেন, খুকু তাঁর চোখের আড়ালে; আবার তিনি যখন চোখ খোলেন, অমনি

দেখতে পান তাঁর খুকুকে।... ঈশ্বর এই জননীর মতো। তিনিই মা, মহামায়া। তিনি এত বিরাট যে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাঁর ক্ষুদ্র সন্তান। জগন্মাতা চোখ বন্ধ রেখে তাঁর সন্তানের সঙ্গে খেলা করেন। আর সারাজীবন ধরে আমরা এই বিশ্বজননীর চোখ খুলে দেবার চেষ্টা করি। যদি কেউ তাঁর চোখ খুলে দিয়ে ক্ষণকালের জন্য তাঁর দৃষ্টির সঙ্গে দৃষ্টি মেলাতে পারে, তবে সেই মুহূর্তে যে সকল রহস্য অবগত হয়, শক্তি, জ্ঞান ও প্রেমে তার হৃদয় পূর্ণ হয়ে যায়।

...এই বিশ্বজননীর চোখ যখন বন্ধ থাকে, তখনই আমরা তাঁকে বলি মা-কালী। কিন্তু সত্যই মায়ের চোখ বন্ধ থাকে না। আমাদের চারিদিকে নিবিড় অন্ধকার, তাই মনে হয় তিনি চোখ ঢেকে আছেন। কিন্তু যে মুহূর্তে তুমি কেঁদে উঠবে, মা তখনই তাঁর সুন্দর, করুণাভরা দৃষ্টি তোমার দিকে মেলে ধরবেন। আর সেই মুহূর্তে তুমি যদি খেলা বন্ধ করে 'কালী' 'কালী' বলে তাঁর বক্ষে তোমার ক্ষুদ্র মুখখানি ঢেকে রাখতে পার, তবে তাঁর হৃদয়ের স্পন্দন শুনতে পাবে। তাঁর চোখ যদি দীর্ঘকাল ধরে বন্ধ থাকে, তবু আমাদের ভয় নেই। একদিন তাঁর অবকাশ মতো যখন এই খেলা সাঙ্গ করবেন, তখন তাঁর দৃষ্টির সঙ্গে আমাদের দৃষ্টির মিলন ঘটবে, আর তখনই আমরা ইহজগত থেকে দূরে, দূরে চলে যাব— অসীমের আর এক প্রান্তে।" ভয়ঙ্করা কালীমূর্তি একমাত্র শিব গভীর ধ্যানে উপলব্ধি করেছিলেন। এটাই নিবেদিতার ব্যাখ্যা। নিবেদিতা কালী প্রসঙ্গেই তাঁর প্রথম পুস্তিকা রচনা করেছিলেন— 'Kali The Mother'। ছোটো পুস্তিকাটি লন্ডন থেকে ১৯০০ সালে প্রকাশিত হয়। অবশ্য তার আগে অ্যালবার্ট হলের বক্তৃতাটি ও কালীঘাটের বক্তৃতা প্রকাশিত হয়েছিল। কালী নিয়ে নিবেদিতার এই বক্তৃতা বা মাতামাতি কলকাতার শিক্ষিত বাঙ্গালিরা সহজ ভাবে নিতে পারেনি। বিলেত থেকে আসা একজন মেমসাহেবকে তারা তাদের সমাজভুক্ত করতে আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু এক 'মধ্যযুগীয় কুসংস্কার' তাঁকে গ্রাস করায় তাঁরা হতাশ হলেন। এই হতাশাগ্রস্তদের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজের কেশবচন্দ্র সেনের অনুগামীরাও ছিলেন। মাদ্রাজের 'Social Reformer' কাগজে (২১ মে ১৮৯৯) সমালোচনা করা হলো নিবেদিতাকে। বলা হলো 'This is revialism with a vengeance'। (নিবেদিতা লোকমাতা— প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩১০, শঙ্করীপ্রসাদ বসু)।

খ্রিস্টান মিশনারি পত্রপত্রিকা তো এর বিরোধিতা করবেই। ভারতবর্ষকে যারা সভ্য করার দায়িত্ব নিয়েছে সেই তাদেরই দেশ থেকে তাদেরই একজন এসে এই সভ্যতার গুণগান করছেন! সুতরাং নিবেদিতা এদের চক্ষুশূল। নিবেদিতার সমস্ত কিছুই ছিল ভারতের প্রাচীন ধর্ম-ভাবনা ও আধ্যাত্মিকতায় সমৃদ্ধ। আচার্য যদুনাথ সরকার এই প্রসঙ্গে বলেছেন— "মানুষের উচ্চতম প্রয়াসের উৎস— ধর্ম। তাই তো আমাদের প্রয়োজন প্রাচীন ভারতের আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার গ্রহণ করিয়া বর্তমান সমাজে তাহার প্লাবনী ধারা প্রবাহিত করা।" এটাই ছিল নিবেদিতার সকল কর্মের উৎস।

যিনি বেদান্তের পূজারি তিনিই কালীর পূজারি। তিনি ধর্মীয় পুনরুজ্জীবনে বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি ধর্মীয় সংস্কারের চিন্তাও স্বামীজীর মতন প্রত্যাখ্যান করেছেন। কিন্তু নির্মাণকে গ্রহণ করেছেন। তিনি বলছেন— "আমাদের পুনর্নির্মাণ করিতে হইবে ধর্মকে। আমাদের পুনরায় গঠন করিতে হইবে 'মহাভারত'।" যে 'Social dynamics' ভারতীয় সমাজকে যুগ যুগ ধরে রেখেছে পাশ্চাত্যের শিক্ষায় তা ভেঙে ফেলার উদ্যোগের যে নাম 'সংস্কার' বিবেকানন্দ বা নিবেদিতা কেউ তা মান্যতা দেননি। কারণ তা দু'দিনের একটা ভাব মাত্র। তাদের জীবন 'পতঙ্গের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী।' 'সাহেবি ভাবাপন্ন ব্যক্তি একেবারে মেরুদণ্ডহীন।' সাহেবদের মতবিরুদ্ধ হলেই তার বিরোধিতা করাই অগ্রগমন। 'কালী'র বিরোধিতাও এই মনোভাব থেকেই উদ্ভূত। এই কারণেই সাহেবদের দেশ থেকে আসা কোনও ব্যক্তির দ্বারাই 'কালী' পূজা বিবেকানন্দের পরিকল্পনা ছিল। নিবেদিতাও যা করেছিলেন তা শুধু স্বামীজীর ইচ্ছাপূরণের উদ্দেশ্যে নয়, তাঁর নিজস্ব ভাবনা ও বিশ্বাসও ছিল তার মূলে।

ভারতের জাতীয় আন্দোলনে যে পৌরুষের প্রয়োজন ছিল তা আধ্যাত্মিক ভূমিতে প্রথিত না হলে ভারতীয়ই হতে পারে না। সুতরাং 'কালী' সাধনাই ছিল সেকালের সাধনা। নিবেদিতা বলছেন— "কালী সম্বন্ধে বলা হয়, তিনি শিবেরই এক শক্তি। তিনি যজ্ঞের এক লেলিহান লাল শিখা, যা অদগ্ধ কাষ্ঠখণ্ডকে কৃষ্ণ অঙ্গারে পরিণত করে। তার রক্তবর্ণ লোলজিহ্বা তারই প্রতীক" (মাতৃরূপা কালী পৃ. ১৭)। জাতির জীবনে পৌরুষ ও ত্যাগের সাধনা ব্যতীত বড় কোনো কিছু অর্জন করা যায় না। এই ত্যাগ ও পৌরুষের, ভয়হীনতা ও মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার প্রতীক 'কালী'। ভারতের যুবকদের ও জাতীয়তাবাদী বিপ্লবীদের এই অভয় মন্ত্র পেতে হবে কালী সাধনার মাধ্যমে। নিবেদিতা বলছেন, "Religion, Called by whatever name, has been ever the love of growth. But to day the flame of renunciation shall be lighted in my lands and consume men with a passion beyond control of thought. Then shall my people thirst for self-sacrifice as others for enjoyment... For this age is great in time, and I, even I, Kali, am the Mother of the nations." অর্থাৎ কালের হিসাবে এ যুগটি শ্রেষ্ঠ, আর আমি, এমনকী আমিও স্বয়ং কালী— সমগ্র মানবজাতির জননী (The complete works of sister Nivedita Vol. 1 Page 494)।

স্বামীজী একদিন নিবেদিতাকে এই ভাবনায় ভাবিত হয়েই বলেছিলেন— "কোনও সন্দেহ নেই, মা শ্রীরামকৃষ্ণের দেহ আশ্রয় করে তাঁর উদ্দেশ্য সাধন করেছেন। দেখো মার্গট, ব্রহ্মাণ্ডের কোথাও এক বিরাট শক্তি আছেন যিনি আপনাকে 'নারী' ভাবনা করেন, তিনিই কালী। আবার ব্রহ্মকেও বিশাস করি।... অসংখ্য কোষ মিলে দেহ গড়ে ওঠে, তৈরি হয় একটা মানুষ, অগম্য মস্তিষ্ক কেন্দ্রে উৎপন্ন হয় এক চেতনা। সর্বত্রই বহুর মধ্যে এক। ব্রহ্ম একমেবাদ্বিতীয়ম্, আবার তিনিই বহু দেবতা"। (ভারত কন্যা নিবেদিতা লিজেল রেমঁ— অনুবাদ নারায়ণী দেবী, পৃ. ১৯৫)

নিবেদিতার 'কালী' ভাবনাও ছিল একই। ভয়হীনতার সাধনাই নিবেদিতার সাধনা। এই সাধনার বাণী, "দায়িত্বকে বোঝা মনে করো না। পুরস্কারের আশা করো না।"

বর্তমান ভারতে এটাই তো সাধনমন্ত্র। কালীপূজার মন্ত্র।

কালের দেবতা কালী

অমিত ঘোষ দস্তিদার

জীবই শিব অর্থাৎ ব্রহ্ম। কারণ শরীর, সূক্ষ্মশরীর সীমায় বাঁধা পড়ে থাকে জীব। নাম রূপাত্মক জগতের উন্মেষ নিমেষ সবই সময়ের সূত্রে বাঁধা। 'কাল' বা 'মহাকাল' যিনি, তাঁরই শক্তি হলেন কালী।

কালী হলেন কালের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। কাল হলো অখণ্ড সময়। আমরা শুধুমাত্র আমাদের ব্যবহারিক সত্তায় অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ হিসাবে তাকে ভাগ করি। মহা প্রলয়ের লীলা এক সমাহারে চলতে থাকে। সেই সমাহারের লীলায় কালী মত্ত থাকেন। এক চরম সাধনায় নিবিষ্ট থেকে কালের বৈতরণী উত্তীর্ণ হয়ে মোক্ষে পৌঁছানোই যখন সাধকের মূল লক্ষ্য হয়, তখন সেই সাধনার তরণী হয়ে প্রকাশিত হন কালের দেবতা কালী।

'কালী' শব্দের উৎস হলো কল্ ধাতু। 'কল্' বা 'কলন' শব্দের অর্থ হলো শব্দ করা, গ্রহণ করা বা গ্রাস করা, গমন করা ও প্রেরণ করা। জগদ্‌বোধের লয়কারিণীরূপ এই অর্থগুলি থেকে খুবই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। 'কলনাৎ সর্বভূতানাং সঃ কলঃ পরিকীর্তিত'— অর্থাৎ কাল সকল ভূত ও ভৌতিক সৃষ্টিকে 'কলন' করেন বা একত্রীকরণ করেন। এই কালের শক্তিই কালী।

জগৎসংসারের যাবতীয় বৈচিত্র্যের সংহার করে, সমস্ত বৈচিত্র্যের সমাহার করে মা কালী সেই সমস্ত কিছুকে এক ও অদ্বিতীয় তত্ত্বের অধীনস্থ করে দ্রবীভূত করেন। সম্যক সাধনার ভুক্তি ও মুক্তি মায়ের স্বরূপে একাকার হয়ে যায়।

প্রপঞ্চময়ী মায়ার নাগপাশের অনাত্মভাবশক্তিকে মহামায়ার সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ পর্যাপ্ত শক্তির মাধ্যমে ছিন্ন করেন। আত্ম এবং অনাত্মের এ এক প্রবল সংগ্রাম। আর এই সংগ্রামের যুধ্যমান স্বরূপই মায়ের করালবদনা মূর্তি। মায়ের করালবদনা মূর্তি রূপের রঙ ঘোর কালো। এই জগৎসংসারের পরিধিতে আছে নানা বর্ণবিশিষ্ট অবয়ব। ব্যবহারের স্বার্থে সেই সব অবয়বের নানা নাম। নানা নামের অবয়বগুলির আছে নানা রঙ। রঙের অর্থই হলো রূপ। জগৎ সংসারের সমস্ত বর্ণ যখন এক হয়, অর্থাৎ এক নির্দিষ্ট কেন্দ্রবিন্দুতে লয়প্রাপ্ত হয়, তখনই তার সমস্ত রূপ অর্থাৎ রঙ হয়ে ওঠে কৃষ্ণ। নাম এবং রূপের বহুত্বে গড়া এই জগৎ এবং সাধকের জীবভাব মায়ের কাছে এসে তুচ্ছময় হয়ে একাকার হয়ে যায়।

ঘোর কৃষ্ণকায়া মাতা মহাকালী মহাশক্তির প্রধান অঙ্গ। অসুর দমনে দেবী দুর্গার তৃতীয় নয়ন থেকে তাঁর সৃষ্টি। মহিষাসুরের পিতা রক্তবীজকে কিছুতেই দমন করতে পারছিলেন না দুর্গা। রক্তবীজের সঙ্গে মোকাবিলা করে তাকে পরাভূত করাই মহাকালীর মূল উদ্দেশ্য। কৃষ্ণকায় অনন্ত শক্তির আধার এই দেবীকে ভগবতী দুর্গার অর্ধাংশ বলে মনে করা হয়।

মহাকালী গুণে আর তেজে দুর্গার সমান। মহাকালীর অনন্ত শক্তিশালী শরীর কোটি সূর্যের ন্যায় ক্ষমতাসম্পন্ন। তাঁকে সম্পূর্ণ সিদ্ধিপ্রদানকারী বলে মনে করা হয়। ভগবান শিবের আর এক নাম মহাকাল। তাঁরই অন্যতম শক্তি হওয়ার কারণে কৃষ্ণকায় দেবীর নাম মহাকালী। চার হাত। কণ্ঠে মুণ্ডমালা। ব্যাঘ্র চর্মের বেশ। লম্বা দন্তরাজি, চঞ্চল জিহ্বা, দু'চোখ রক্তবর্ণ, চওড়া কর্ণ আর মুখ খোলা তাঁর। ভদ্রকালী, শ্মশানকালী, গুহ্যকালী, রক্ষাকালী এরকম নানা নামে অনেক রূপ। আরও এক প্রসিদ্ধ নাম চামুণ্ডাদেবী। অসুরদের সঙ্গে তুমুল যুদ্ধ চলাকালীন এই দেবী চণ্ড ও মুণ্ড নামে দুই মহা অসুরকে সংহার করেন। এরপরই দেবী চামুণ্ডা নামে পরিচিত হন।

অধর্মের উৎসাহদানকারী দুষ্টকে সমুচিত শিক্ষা দান করে তাঁর প্রকৃত ভক্তকে অভয় প্রদান করেন মহাকালী। এমনকী ভগবান বিষ্ণু ও ব্রহ্মা যখন দুই অসুর মধু-কৈটভের জন্য সংকটগ্রস্ত হন তখন মহাকালী দুই দেবতাকে ভয়মুক্ত করেন। দেবী খড়্গ, চক্র, গদা, বাণ, ধনুক, ত্রিশূল ইত্যাদি নানা আয়ুধে সুশোভিত।

ব্রহ্মার অংশ মহাসরস্বতী, বিষ্ণুর অংশ মহালক্ষ্মী আর শিবের অংশ হলেন মহাকালী। মহাসরস্বতী, মহালক্ষ্মী এবং মহাকালী হলেন আদিশক্তি। তিনভাবে তাঁরা লীলা প্রদর্শন করেন। মহাসরস্বতী বাণী, বিদ্যা, বুদ্ধি ও জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী। মহালক্ষ্মী পরম শুদ্ধ-সত্ত্ব-স্বরূপা। মাতাকালী মহাশক্তি স্বরূপা। আধ্যাত্মিকরূপে এঁরা জ্ঞানশক্তি, মহাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তির প্রতীক। বৈষ্ণোদেবী হলেন এই তিন আদিশক্তির তিন 'পিণ্ডি' বা মস্তকের মিলিতরূপ। এই তিন তেজোশক্তির সাহায্যে এক আলোকবৃত্তের মধ্য থেকে বৈষ্ণোদেবীর সৃষ্টি।

মা ভগবতীর নয় রূপ— মাতা কালিকাসহ মাতা চামুণ্ডাদেবী, মাতা কাংড়েওয়ালি, মাতা ব্রজেশ্বরীদেবী, মাতা জ্বালামুখী, মাতা চিন্তপূরণী, মাতা নয়নাদেবী, মাতা মনসাদেবী এবং মাতা শাকম্ভরীদেবীকে নয় ভগিনীরূপেও মানা হয়।

মা কালীর দক্ষিণা রূপটি দাক্ষিণ্যে ভরা। মা সেখানে বড়ই করুণাময়ী। দক্ষিণেশ্বরে মায়ের এই রূপই শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনায় মৃন্ময়ী ভবতারিণী মূর্তিতে চিন্ময়ী জগন্মাতারূপে আবির্ভূতা। হালিশহর রামপ্রসাদের ভূমি। সেই ভূমি থেকে রামপ্রসাদ গেয়ে ওঠেন — 'মন করো না দ্বেষদ্বেষি / যদি হবি রে বৈকুণ্ঠবাসী / ঐ যে কালী, কৃষ্ণ, শিব রাম / সকল আমার এলোকেশী।'

জয়পুরে সক্ষম-এর রাষ্ট্রীয় অধিবেশন

গত ২৯-৩০ সেপ্টেম্বর রাজস্থানের জয়পুর শহরে জামডোলির কেশব বিদ্যাপীঠে 'সক্ষম'-এর দশম রাষ্ট্রীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। অধিবেশনে দেশের সাংগঠনিক ৪২টি প্রান্তের থেকে ১৫০০ কার্যকর্তা অংশগ্রহণ করেন। এর মধ্যে ৬০০ দিব্যাঙ্গজন। পশ্চিমবঙ্গ থেকে ৪ জন দিব্যাঙ্গ-সহ ৩৪ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সক্ষমের অখিল ভারতীয় সংরক্ষক ডাঃ মিলিন্দ কসবেকর এবং রাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষ ডাঃ দয়াল সিংহ পওয়ার। এছাড়া কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় ও অধিকার দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী কিশনপাল গুর্জর, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক

সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকারিণীর সদস্য সুহাসরাও হিরেমঠ এবং অধিবেশনের আয়োজন সমিতির অধ্যক্ষ গণেশ রানা। অধিবেশনে সক্ষমের রাষ্ট্রীয় সংগঠন সম্পাদক ডাঃ সুকুমার বার্ষিক প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন দিব্যাঙ্গদের ইউনিক আই ডি তৈরিতে দেশের মধ্যে রাজস্থান প্রথম স্থানে রয়েছে। অধিবেশনের সমাপ্তি সত্রে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, দিব্যাঙ্গদের করুণা করার প্রয়োজন নেই, তাঁদের প্রয়োজন আত্মীয়তাপূর্ণ ব্যবহার ও সহযোগিতা। তাঁরা সবসময় আমাদের সমাজে আমাদের ভাই হিসেবে রয়েছেন।

শিলচরে স্বস্তিকার পাঠক সম্মেলন

সম্প্রতি জাতীয়তাবাদী নির্ভীক সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকার এক মনোজ্ঞ পাঠক সম্মেলন শিলচর কেশব নিকেতনে প্রথমবার অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে বিশেষ ভাবে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কেন্দ্রিয় কার্যকারিণী সমিতির সদস্য সুনীলপদ গোস্বামী। এছাড়াও দক্ষিণ অসম প্রান্তের প্রান্ত সঙ্ঘচালক বিমলনাথ চৌধুরী ও সহ-প্রান্ত সঙ্ঘচালক জ্যোৎস্নাময় চক্রবর্তী উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত পাঠকদের মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করতে হয় ড. শংকর ভট্টাচার্য, অমলেন্দু চক্রবর্তী, ক্ষৌনিশ চক্রবর্তী, ত্রিবেণী প্রসাদ চক্রবর্তী, রাজীবদেব পুরকায়স্থ, উপেন্দ্র চন্দ্র নাথ, বিজন নাথ, বলদেব সিংহ, ড. মন্দিরা দত্তচৌধুরী, পাপলি কর্মকার, জওহরলাল পাল প্রমুখ।

সুনীলপদ গোস্বামী উল্লেখ করেন যে, বিগত ৭০ বছর ধরে নির্ভীক ও নিরপেক্ষভাবে তথ্য পরিবেশন করে চলেছে স্বস্তিকা পত্রিকা। নানান প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও নিরবচ্ছিন্ন ভাবে চলা বাংলা ভাষায় সম্ভবত এই পূর্ব ভারতে তথা বিশ্বের বাংলাভাষী পাঠকদের মধ্যে স্বস্তিকাই একমাত্র পত্রিকা। প্রান্ত সঙ্ঘচালক বিমল নাথ চৌধুরী বলেন রাষ্ট্রের কল্যাণে সঠিকভাবে সঠিক খবর ও চিন্তাধারা এই পত্রিকার মাধ্যমে পাঠকরা পাচ্ছেন। জ্যোৎস্নাময় চক্রবর্তী আশা প্রকাশ করেন প্রত্যেক পাঠক যদি ১ জন করেও গ্রাহক অন্তর্ভুক্ত করেন তবে এখানে রাষ্ট্রগঠনের গতি আরও বাড়বে। সম্মেলন পরিচালনা করেন স্বস্তিকার প্রচার প্রতিনিধি গৌরাঙ্গ ভট্টাচার্য। একক সংগীত পরিবেশন করেন সম্রাট দাশ।

হাওড়ায় সচেতন নাগরিক মঞ্চের আলোচনা সভা

গত ৩ অক্টোবর হাওড়া শরৎ সদন ১নং প্রেক্ষাগৃহে সচেতন নাগরিক মঞ্চের পক্ষ থেকে জাতীয় সংহতি বিষয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস জাতীয় সংহতির উপর বিশেষ করে জাতীয় নাগরিক পঞ্জিকরণ (এন আর সি) সম্বন্ধে সুচিন্তিত বক্তব্য রাখেন। বাংলাদেশ, পাকিস্তান থেকে আগত হিন্দু, বৌদ্ধরাই শুধুমাত্র শরণার্থী; মুসলমানরা নয়। তিনি বলেন, ভারতে দ্বিজাতি বলে কখনই হিন্দু মুসলমান দুটো জাতি ছিল না। যে দ্বিজাতি তথ্যের ভিত্তিতে দেশ ভাগ হয়েছিল সেটা সম্পূর্ণ ভুল। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রান্ত কার্যবাহ ড. জিষ্ণু বসু আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেন বাংলাদেশ থেকে আগত হিন্দুরাই কেবল শরণার্থী, মুসলমানরা অনুপ্রবেশকারী (ইল্‌লিগ্যাল ইমিগ্র্যান্ট)। সবাই শরণার্থী হতে পারে না। ইউনাইটেড নেশনস্ হাইকমিশন ফর রিফিউজিস তাদের ১৯৫৯ সালে জেনেভা বৈঠকে উদ্বাস্তু বা রিফিউজির সংজ্ঞা তৈরি করে— এটা বিজেপি আর এস এস তৈরি করেনি। ড. বসু তার দীর্ঘ আলোচনায় বাংলাদেশ বা পূর্ব পাকিস্তান থেকে সর্বস্বান্ত হয়ে ভারতে আসা হিন্দু উদ্বাস্তুদের সঙ্গে কংগ্রেস বা বামপন্থী দলগুলি যে অমানবিক, নির্মম ব্যবহার করেছিল তার চিত্র দর্শকদের সামনে তুলে ধরেন। তিনি বলেন এই প্রথম কোনো সরকার হিন্দু শরণার্থীদের জন্য সিটিজেনশিপ পঞ্জিকরণ বিল তৈরি করেছে। এই শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত হলে বসে শুধু আলোচনা করলেই হবে না। এর সুফল সবাইকে বোঝাতে হবে। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন নরেন্দ্র আগরওয়াল। প্রারম্ভিক ভাষণ দেন সৈকত বসু। শিবেন্দ্র ত্রিপাঠীর মনোজ্ঞ বন্দে মাতরম্ সঙ্গীত দিয়ে আলোচনা সভা শেষ হয়।

কর্মযোগী যুগলকিশোর জৈথলিয়া স্মৃতি ব্যাখ্যানমালা

গত ৭ অক্টোবর শ্রীবড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয়ের উদ্যোগে কর্মযোগী জুগলকিশোর জৈথলিয়ার স্মৃতির উদ্দেশে তৃতীয় ব্যাখ্যানমালা আয়োজন করা হয় পুস্তকালয়ের সভাকক্ষে। এবারের ব্যাখ্যানমালার বিষয় ছিল 'জয়প্রকাশ নারায়ণের স্বপ্নের ভারত'। মুখ্যবক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইন্দিরা গান্ধী রাষ্ট্রীয় কলাকেন্দ্রের অধ্যক্ষ প্রখ্যাত সাংবাদিক পদ্মশ্রী রামবাহাদুর রায়।

অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলংকৃত করেন মাখনলাল চতুর্বেদী, পত্রকারিতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব কুলপতি পণ্ডিত অচ্যুতানন্দ মিশ্র। স্বাগত ভাষণ রাখেন পুস্তকালয়ের সচিব মহাবীর বাজাজ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ডাঃ তারা দুগড় এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন লক্ষ্মীনারায়ণ ভালা। অনুষ্ঠানে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

বিবেকানন্দ স্টাডি সার্কেলের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও যুব সম্মেলন

বিষ্ণুপুর বিবেকানন্দ স্টাডি সার্কেলের উদ্যোগে গত ১৬ সেপ্টেম্বর বাঁকুড়া জেলার ৩৬টি বিদ্যালয়ের ১৬৫ জন ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও যুব সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সম্মেলনে প্রবন্ধ রচনা, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা, আবৃত্তি ও ক্যুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কৃত করা হয় এবং সকল প্রতিযোগীকে অংশগ্রহণ করার শংসাপত্র দেওয়া হয়। পুরস্কারগুলি ঠাকুর, মা, স্বামীজী ও নিবেদিতার জীবনী ও উপদেশ সংবলিত।

অনুষ্ঠানটি স্বামীজীর শিকাগো বক্তৃতার ১২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হয়। যুব সম্মেলনটি রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার গোলপার্কের সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন রামকৃষ্ণ মিশনের বিশিষ্ট সন্ন্যাসী স্বামী বেদস্বরূপানন্দজী মহারাজ। বিকেলে ধর্মসভার আয়োজন করা হয়। সেখানে ভক্তিলাভের উপায় সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেন স্বামী বেদস্বরূপানন্দজী মহারাজ।

ঠাকুরনগরে নাগরিকপঞ্জির আলোচনা সভা

বৃহত্তর ঠাকুরনগর সচেতন নাগরিক মঞ্চের উদ্যোগে গত ২২ সেপ্টেম্বর উত্তর ২৪ পরগনার ঠাকুরনগরে রাষ্ট্রীয় নাগরিক পঞ্জি বিষয়ক এক আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে বক্তব্য রাখেন বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. কল্যাণ চক্রবর্তী, কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী সৈকত বসু। সভামুখ্য ছিলেন গৌরাঙ্গ দাস। পশ্চিমবঙ্গে নাগরিকপঞ্জির কাজ কেন শুরু করা উচিত এবং পশ্চিমবঙ্গের নাম কেন পরিবর্তন করা উচিত নয়, সে বিষয়ে সভাকে বিস্তারিত জানান ড. চক্রবর্তী। অসমে কেন এন আর সি লাগু করতে হলো তার প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন আইনজীবী সৈকত বসু। সভায় উত্থাপিত বহু প্রশ্নের উত্তর দেন উপস্থিত বক্তারা। প্রাসঙ্গিক স্বরচিত কবিতা পাঠ করে শোনান অধ্যাপক চক্রবর্তী। কলকাতার কনক্লেভ অব কনসাস সিটিজেন্সের তরফে প্রকাশিত এন আর সি বিষয়ক পুস্তিকা বিক্রি করা হয়। আগামী দিনে উত্তর ২৪ পরগনা জুড়ে এই ধরনের সভার আয়োজন করা হবে, জানিয়েছেন স্থানীয় উদ্যোক্তারা।

ধর্মজাগরণ সমন্বয় বিভাগের কার্যকর্তা প্রশিক্ষণবর্গ

গত ৬-৭ অক্টোবর হাওড়ায় ধর্মজাগরণ সমন্বয়ের পক্ষ থেকে দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের দুদিনের কার্যকর্তাদের অভ্যাসবর্গ সম্পন্ন হয়। হাওড়া মল্লিক ফটক বাদামীদেবী শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে দক্ষিণবঙ্গের ১০টি জেলা থেকে মোট ৫২ জন কার্যকর্তা উপস্থিত ছিলেন। বর্গে ধর্মজাগরণ সমন্বয়ের অখিল ভারতীয় সহ-প্রমুখ রাজেন্দ্রজী ও পূর্বক্ষেত্র প্রমুখ বিনয় ভুইয়া এবং দক্ষিণ বঙ্গ প্রান্ত প্রমুখ বিশ্বনাথ সাহা বর্গে অংশগ্রহণকারী কার্যকর্তাদের পথনির্দেশ করেন। ৭ অক্টোবর দুপুরে সমাপ্তি অনুষ্ঠানে রাজেন্দ্রজী, অশোক মোদীজীর হাতে ধর্মজাগরণের কাজে উপযোগী আত্মসাৎ করার পুণ্যপ্রবাহ বইটির বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করা হয়।

স্বস্তিকার গ্রাহক সংগ্রহ অভিযান সভা

গত ৩০ সেপ্টেম্ব সন্ধ্যায় স্বস্তিকা গ্রাহক অভিযানের প্রাক উদ্বোধনী সভা বালিগঞ্জ এলাকার প্রচার প্রতিনিধি মিতালি সাহার উদ্যোগে বালিগঞ্জ ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের পূজ্যপাদ বিশ্বাত্মানন্দ মহারাজ। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় সহ-প্রচার প্রমুখ অদ্বৈতচরণ দত্ত এবং দক্ষিণবঙ্গের প্রান্ত বৌদ্ধিক প্রমুখ সারদা প্রসাদ পাল।

বিশ্বাত্মানন্দজীর করকমলে প্রথমেই এ বছরের স্বস্তিকা পূজা সংখ্যা তুলে দেওয়া হয়। স্বামীজী বলেন, এই ধরনের পত্রিকায় হিন্দুত্ববোধের প্রচার খুবই আনন্দের বিষয়। আমাদের এর ব্যাপকভাবে প্রচার করা দরকার। অদ্বৈতচরণ দত্ত বলেন, আমরা এই পত্রিকার গ্রাহক অভিযানের কার্যক্রমে থাকতে পেরে খুবই আনন্দিত। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রণব পত্রিকা যেরকম হিন্দুত্ববোধের প্রচার করে, ঠিক তেমনই স্বস্তিকাও প্রচার করে থাকে।

সমাজ কল্যাণ ব্রতীদের খোঁজে ইন্ডিয়ান সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটি নেটওয়ার্ক

কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রকের অধীন 'ইন্ডিয়ান সোস্যাল রেসপনসিবিলিটি নেটওয়ার্ক' (আই এস আর এন)। অর্থনৈতিকভাবে সমাজের পিছিয়ে থাকা লোকেদের জন্য যাঁরা নীরবে কাজ করে চলেছেন, তাঁদের খোঁজে উদ্যোগী হয়েছে সংগঠন। এ রাজ্যে এই সংগঠনের দায়িত্বপ্রাপ্ত মিতালি সাহা জানান, রাজ্যের বিভিন্ন জেলার প্রায় ২০ জনের নাম-পরিচয় ইতিমধ্যে পাঠানো হয়েছে দিল্লিতে। এই তালিকায় আছেন নিতাই প্রামাণিক। পেশায় চিকিৎসক। স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনের অ্যাসোসিয়েট প্রোফেসর। গরিব লোকেদের প্রায় নিখরচায় চিকিৎসা করেন। আছেন সুশান্ত কবিরাজ। তিনি বাঁকুড়া জেলার খাতরার গোরাবাড়ি হাই স্কুলের শিক্ষক। সকাল-সন্ধ্যায় দিনের পর দিন নিখরচায় গরিব, মেধাবী ছেলেমেয়েদের পড়িয়ে ভালো ফল করাচ্ছেন। এ রকম নানা পেশার মানুষ। অসম ভবনের সভায় আই এস আর এন-এর সিইও ডঃ সন্তোষ গুপ্ত বলেন, ''এই অন্ত্যোদয় সেবা বিচার মন্থন উৎসর্গ করা হচ্ছে পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের নামে। তাঁর ভাবনা অনুযায়ী নিরন্তর সম্মেলনে বিশেষভাবে উপস্থিত ছিলেন দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে এদেশের রক্তদান আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করা ইঞ্জিনিয়ার দেবব্রত রায়। তাঁর মতো নিষ্ঠাবান কিছু সমাজকর্মীর অক্লান্ত চেষ্টায় রক্তদান আন্দোলনে এই রাজ্য টানা বেশ কয়েক বছর ছিল শীর্ষস্থানে। তিনি ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব ব্লাড ডোনার অ্যাসোসিয়েশনের প্রাক্তন ভাইস প্রেসিডেন্ট।

সামাজিক সদ্ভাব কর্মশালা

গত ৩০ সেপ্টেম্বর অখিল ভারতীয় সামাজিক সদ্ভাব প্রমুখ অশোক বেরীর উপস্থিতিতে দক্ষিণবঙ্গের জেলা প্রমুখ ও প্রতিনিধিদের একটি কর্মশালা হাওড়া মহানগরের শিবপুর মন্দিরতলাতে কেশব স্মৃতিতে অনুষ্ঠিত হয়। শ্রী বেরী বলেন, 'ভারতমাতাই আমাদের আরাধ্যা দেবী হউন' স্বামীজীর বিবেকময় এই ভাবকে পাথেয় করে সমাজের সকল জাতি সমূহের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস ও সামাজিক সদ্ভাবের পরিবেশ গড়ে তোলাই আমাদের উদ্দেশ্য। আগামীদিনে প্রদেশের প্রতিটি জেলাতে সামাজিক সদ্ভাব টোলি গঠনের মধ্যে জেলায় জেলায় এরকম কর্মশালা কীভাবে হবে তার যোজনা প্রস্তুত করা হয়।

পঞ্চবটীতে সংস্কৃত সম্ভাষণ শিবির

সংস্কৃত ভারতীর উদ্যোগে পঞ্চবটী গ্রামের জ্যোতির্ময়ী ভবনে গত ২৫ সেপ্টেম্বর থেকে ৬ অক্টোবর পর্যন্ত দশ দিন ব্যাপী সংস্কৃত সম্ভাষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে প্রতিদিন ডি এন সি মহাবিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের প্রথমবর্ষের ১২ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। শিবিরে শিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডি এন সি মহাবিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র দুর্যোধন ঘোষ। সমারোপ কার্যক্রমে সংস্কৃত ভারতীর উত্তরবঙ্গ প্রান্ত শিক্ষণ প্রমুখ সুমন্ত প্রামাণিক উপস্থিত ছিলেন। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীরা দশ দিনে যতটা শিখেছেন ততটাই গান নাটক ও অভিনয়ের মাধ্যমে প্রদর্শন করেন।

পরম্পরা

যশোমাধব ও ঢাকেশ্বরী

জলজ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলাদেশের ঢাকা থেকে উত্তর-পশ্চিম কোণে তিরিশ কিলোমিটার দূরে বংশী নদীর শাখা কাঁকলাই নদীর দক্ষিণ তীরে ধামরাই নামে গ্রাম ছিল। গ্রামটির প্রাচীন নাম ধর্মরাজিয়া। মৌর্যসম্রাট অশোক তাঁর সাম্রাজ্যে চুরাশি হাজার ধর্মরাজিকা বা কীর্তিস্তম্ভ নির্মাণ করেছিলেন। তার মধ্যে ধামরাই গ্রামে কোনও ধর্মরাজিকা ছিল। ফলে ধর্মরাজিকা থেকে ধর্মরাজিয়া এবং পরবর্তীকালে এর অপভ্রংশ নাম হয় ধামরাই। এই জায়গায় ১০-১১ শতক পর্যন্ত পালবংশীয় রাজারা রাজত্ব করতেন। আজ থেকে প্রায় ৯০০ বছর আগে ধামরাইয়ে যশোমাধব নামে নারায়ণের একটি মন্দির তৈরি হয়েছিল।

পুরীধামে শ্রীজগন্নাথের প্রথম কলেবর নির্মাণ করে যে অবশিষ্ট কাঠ পড়েছিল, ওই কাটকুটো দিয়েই যশোমাধবের বিগ্রহ তৈরি করেন বিশ্বকর্মা— শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ নারায়ণের মূর্তি। সেই বিগ্রহ কেমন করে যেন চলে যায় পাতালে। কেউই তাঁর হদিশ জানত না। একবার পালবংশীয় রাজা যশোপাল একটা সাদা একদন্তী হাতির পিঠে চেপে ঘুরতে ঘুরতে রাজধানী মাধবপুর থেকে ১০ কিলোমিটার দূরে ধর্মরাজিয়া গ্রামে চলে আসেন। ধর্মরাজিয়ার কাছে শিমুলিয়া গ্রামে এক উঁচু ঢিবির সামনে এসেই হাতি থমকে দাঁড়ায়। কিছুতেই তাকে নড়ানো যায় না। রাজার কেমন সন্দেহ হয়। তিনি স্থানীয় লোকজনকে সামনের ঢিবিটি খুঁড়তে বলেন। লোকজন ঘণ্টাখানেক ধরে মাটি খুঁড়ল। তারপর প্রায় দশ ফুট তলা থেকে উঠে এল যশোমাধবের নয়নাভিরাম মূর্তি। রাজা হাতির পিঠ থেকে নেমে এলেন। তখন কে যেন রাজার কানে-কানে বলল, 'রাজা, তুমি যশোমাধবকে গ্রহণ করো না। করলে তোমার ধনসম্পদ বিনষ্ট হবে। বংশ নির্বংশ হবে। যশোমাধব এই পাপপূর্ণ পৃথিবীতে থাকতে চান না।' কিন্তু রাজা যশোমাধবকে দেখেই মোহিত। তিনি আপনমনে বললেন, 'একবার যখন পেয়েছি, তখন আর মাধবকে ছাড়ছি না। মাধবই আমার ধনসম্পদ, বংশ সব। যা হবার তা হবে। শুধু মাধবই থাকবে।' তিনি মাধবকে ঘরে এনে মহাসমারোহে প্রতিষ্ঠা করলেন। তারপর কেটে গেল অনেক বছর। যশোপাল নির্বংশ হলেন। শোকে দুঃখে তিনি চলে গেলেন পরলোকে। রাজার নাম জড়িয়ে মাধব হলেন যশোমাধব। যশোপালের মৃত্যুর পর স্থানীয় ওড়িশার পাণ্ডারা বিগ্রহের পুজো করতে থাকে। কিছুদিন পরে গৌড়বঙ্গে তুর্কি আক্রমণে শঙ্কিত পূজারিরা মন্দির ছেড়ে পালিয়ে যায়। যশোমাধবের বিগ্রহ পড়ে থাকে জঙ্গলে। পূজারিরা ফেলে দিয়ে গিয়েছিল। পরবর্তীকালে গোবিন্দ বসাক নামে স্থানীয় জমিদার জঙ্গল থেকে বিগ্রহ উদ্ধার করে শিমুলিয়া গ্রামের এক ব্রাহ্মণকে দান করেন। ব্রাহ্মণ মূর্তিটি নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে নিত্যপুজো করতেন। প্রতিদিন বংশী নদীতে স্নানও করাতেন। পরে মেয়ের বিয়ের সময় জামাই রামজীবন মৌলিককে যৌতুকস্বরূপ বিগ্রহটি দিয়েছিলেন। রামজীবনের বাড়ি ছিল ধামরাইতেই। তিনি যশোমাধবের বিগ্রহ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন। কিছুদিন পরে কোথা থেকে এক সন্ন্যাসী ধামরাই গ্রামে আসেন। তাঁর কাছে একটি নিমকাঠের অষ্টভুজা আদ্যাশক্তি মূর্তি ছিল। তিনি মূর্তিটি যশোমাধবের মন্দিরেই স্থাপন করে উধাও হন। আরও পরে এক সাধু এসে যশোমাধব মন্দিরে কাঠের বলদেব বিগ্রহ রেখে চলে যান। স্থানীয় পণ্ডিত অমর সিংহ ভট্টাচার্য একটি কানাই মূর্তি তৈরি করে বলদেবের পাশে প্রতিষ্ঠা করেন। একসময় যশোমাধবের রথযাত্রা হতো সাড়ম্বরে। আর বিশেষ পুজো উপলক্ষ্যে মেলা বসতো উত্থান একাদশী ও মাঘী পূর্ণিমায়। ধামরাইয়ের যশোমাধবের মতো ঢাকা শহরের ঢাকেশ্বরী কালী সম্বন্ধেও লোকশ্রুতি রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, ঢাকেশ্বরী থেকেই এই জনপদের নাম হয়েছে ঢাকা। ঢাকেশ্বরী মন্দির একটি উপপীঠ। এখানে দেবীর উজ্জ্বল গয়নার অংশ পড়েছিল। বহুকাল আগে ১২ শতকে ঢাকেশ্বরী মন্দির ছিল জঙ্গলাকীর্ণ। কোনও কারণে বা অপরাধে এখানে সেনবংশের রাজা বল্লালসেনের মাকে অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় বনবাস দেওয়া হয়েছিল। বল্লালসেনের মা রাজরানি বিলাসদেবী বনবাসে এসে ঢাকেশ্বরীর আরাধনা করতেন। অপার-মান্দারের রাজকন্যা এবং রাজা বিজয়সেনের রানি বিলাসদেবী ছিলেন ধর্মপরায়ণা নারী। সূর্যগ্রহণ উপলক্ষ্যে একবার তিনি এক ব্রাহ্মণকে সোনার ঘোড়া ও একটা গ্রাম দান করেছিলেন। যাই হোক, এই বনেই জন্ম হয় বল্লালসেনের। বনে জন্ম ও লালিত— তাই তাঁর মা নাম রেখেছিলেন বনলাল বা বল্লাল। পরবর্তী সময়ে শিবের উপাসক বল্লালসেন যখন ঘটনাচক্রে রাজা হলেন, তখন বনজঙ্গল কেটে তিনি দেবীর সুন্দর মন্দির নির্মাণ করেন এবং জনসাধারণও বসবাস করতে শুরু করে। বল্লাসসেন দেবীর পুজোর দায়িত্ব দেন এক সন্ন্যাসীকে। ঢাকেশ্বরী সম্পর্কে আর একটি প্রবাদ : মহারাজ মানসিংহ বিক্রমপুরের অধিপতি কেদার রায়কে পরাজিত করে তাঁর গৃহদেবী অষ্টধাতুর কালীকে নিয়ে ঢাকায় চলে আসেন। পরে ওই মূর্তিটির অনুরূপ মূতি গড়ে, মূল মূর্তিটিকে জয়পুরে নিয়ে চলে যান। নতুন মূর্তিটি ঢাকেশ্বরী নামে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়। ▌

মঞ্জুভাস প্রকাশিত

গুরু বিশ্বাস-এর উপন্যাস

সাড়ে চারশ পাতা জুড়ে বইটি কেবল অরণ্যের কথা, অসহায় আরণ্য প্রাণীদের কথা, মানুষ নামের অসংখ্য পোকার কথা এবং একটি লোকের মনুষ্যত্বে আরোহনের কথা

পোকা

একটি ব্যতিক্রমী উপন্যাস, ৫ম মুদ্রণ ২৫০্

বাংলা সাহিত্যে যে বিষয় নিয়ে উপন্যাস লেখা হয়নি তেমনই এক দরদী কথা

স্বপ্নলোকের চাবি ২৫০্

কেউ ভেবেছেন কলকাতা নগরীকে তিনশো বছর ধরে যারা পরিষ্কার রাখছে তাদের জীবন নিয়ে গ্রন্থ লেখা যায়? সেই কথা

ঝোপড়পট্টি ২৫০্

বিশ্বের প্রাচীনতম পেশা পণ্য নারীদেহ বিক্রয়ের বৃহত্তম বাজার নিয়ে উপখ্যান

পরীতলা

(১ম) খণ্ড তৃতীয় মুদ্রণ ২৫০্
(২য়) খণ্ড তৃতীয় মুদ্রণ ২৫০্

বীজ ৩৫০্

আর সদ্য প্রকাশিত উপন্যাস

অরিষ্ট ১৭০্

প্রশান্ত প্রমাণিক-এর

ভারতবর্ষের প্রাচীন বিজ্ঞান-এর কথা

কপিল থেকে চন্দ্রশেখর ৬০০্

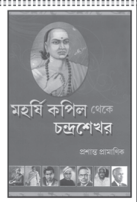

ও

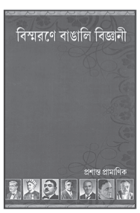

সদ্য দেখে আসা

বিস্মরণে বাঙালি বিজ্ঞানী ২৪০্

মানসের তীরে মহিমান্বিত কৈলাস ১২০্

প্রিটোনিয়া

১৪ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা -৯
☎২২৪১-২১০৯/৯০৬২৪৭৪৭৪০
publishers.pritonia2015@gmail.com

স্বস্তিকার সকল পাঠক-পাঠিকা, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীকে আন্তরিক অভিনন্দন—

A Well Wisher

সুরেন্দ্র চন্দ্র বসাকের

অত্যাধুনিক গয়নার ডিজাইনের ক্যাটালগ

সুপার

যে কোন স্বর্ণকারকে দেখাতে বলুন

ক্যাটালগের জন্য যোগাযোগ করুন

9830950831

ALWAYS EXCLUSIVE

Vandana (NR) ®

SAREES • SUITS

Mfg. of Cotton Printed & Embroidary Sarees

Contact No. : 033-22188744 / 1386

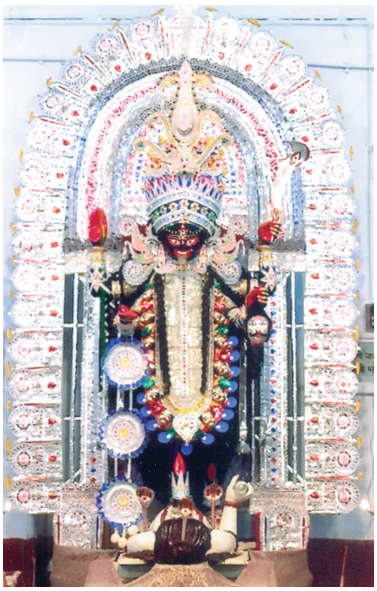

বৌবাজার হালদার বাড়ির ঐতিহ্যময় কালীপুজো

সপ্তর্ষি ঘোষ

আশ্বিন মাসে দুর্গাপুজো দিয়ে শুরু হয় বাঙ্গালির উৎসব মরশুম। তারই অঙ্গ হিসাবে কার্তিক মাসের অমাবস্যায় কালীপুজো। কালীপুজো মানেই আলোর উৎসব। কালকে গ্রাস করেন বলেই তিনি কালী। দেবী কালিকা অশুভ শক্তিনাশিনী। একদিকে তিনি সমস্ত ধ্বংসলীলার কর্ত্রী, অন্যদিকে সৃষ্টির বীজও তাঁর মধ্যে প্রস্ফুটিত আছে। জগতে সৃষ্টি আর ধ্বংসের যে লীলা প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে, তাকেই দেবী কালিকা সংযুক্ত করে রেখেছেন।

কলকাতা শহরে বেশ কিছু বনেদি পরিবার আছে, যারা নিষ্ঠা, ঐতিহ্য ও পরম্পরা বজায় রেখে প্রতি বছর কার্তিক মাসের অমাবস্যায় নিজ গৃহে শক্তি আরাধনায় ব্রতী হন। মধ্য কলকাতার বৌবাজার অঞ্চলে ১৫ নম্বর রমানাথ কবিরাজ লেনের হালদার বাড়িতে কালীপুজোর সূচনা হয় ইংরেজি ১৭৫০ সালে। সূত্রপাত করেন আদিপুরুষ লক্ষ্মীনারায়ণ হালদার। এবার এদের পুজো ২৬৯তম বর্ষে পদার্পণ করল। শুরু থেকে একই ঠাকুরদালানে পুজো অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কালীপুজোর বর্ণনায় যাবার আগে হালদার পরিবার সম্বন্ধে কিছু প্রাসঙ্গিক তথ্য জেনে নেওয়া যাক।

হালদার পরিবারের আদি নিবাস ছিল হুগলি ও বর্ধমান জেলার মধ্যবর্তী বাদলা গ্রামে। সতেরশো শতকের মাঝামাঝি সময়ে কলকাতায় আসেন লক্ষ্মীনারায়ণ হালদার। বাদ্‌লা গ্রামে ছিল তাদের জমিদারি। হালদাররা ছিলেন ব্যবসায়ী পরিবার। বাড়ির কেউ পরের গোলামি করতে পারবে না, এই ছিল পরিবারের রীতি। কলকাতাতেও বৌবাজার, সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ প্রভৃতি অঞ্চলে হালদারদের প্রচুর জমিজমা ছিল। চা বাগান, হার্ডওয়ারের ব্যবসা, জাহাজ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ ছিল হালদার পরিবারের মূল ব্যবসা। লক্ষ্মীনারায়ণের চতুর্থ অধস্তন পুরুষ রাখালদাস হালদারের সময় ব্যবসা আরও প্রসারিত হয়। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ব্যবসা- বাণিজ্যের সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে হালদাররা প্রথম সারিতে ছিলেন। সেই সময় কলকাতার অভিজাত 'ক্যালকাটা ক্লাব', 'বেঙ্গল ক্লাব' এবং 'টালিগঞ্জ ক্লাব'-এর সদস্য ছিলেন রাখালদাস হালদার। ক্যালকাটা ক্লাবের প্রথম দশজন ভারতীয় সদস্যের মধ্যে অন্যতম ছিলেন রাখালদাসবাবু। হালদার পরিবারের পক্ষে নিঃসন্দেহে এটি গর্বের বিষয়। ১৯৪৩ সালে কলকাতায় প্রথম টেলিফোরন সংযোগ দেওয়া হয় যে পঞ্চাশটি, তার মধ্যে একটি ছিল হালদার পরিবারের। সেটি এখনও সযত্নে রক্ষিত আছে। প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে হালদার পরিবারের সদস্যদের স্বদেশী আন্দোলনে অংশগ্রহণের কথা জানা যায়। ষাটের দশকে ভূ-দান যজ্ঞের সময়ে আচার্য বিনোবা ভাবে বেশ কিছুদিন হালদার বাড়ির দোতলায় অবস্থান করেছিলেন।

দুর্গাপুজোর মহাষ্টমীতে প্রতিমার কাঠামো পুজো হয় এবং তার আগে প্রতিপদ থেকে ষষ্ঠীর মধ্যে কাঠামোর কাঠ সংগ্রহ ও সূত্রধর দিয়ে কাঠামো তৈরি করে রাখা হয়। মহাষ্টমীতে কাঠামো পুজোর পর মৃৎশিল্পীকে বায়না দেওয়া হয়। কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো থেকে ঠাকুরদালানেই প্রতিমা তৈরি শুরু হয়। কুমোরটুলির একই পরিবারের শিল্পী তিনপুরুষ ধরে প্রতিমা তৈরি করছেন।

ডাকের সাজে সজ্জিতা দক্ষিণাকালী মূর্তি। কৃষ্ণনগর থেকে শিল্পী এসে ডাকের সাজে প্রতিমাকে সাজান, যে সাজ সত্যিই দৃষ্টিনন্দন। শিল্পী বাবলু বোস ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার অবসরপ্রাপ্ত কর্মী। পিছনের চালচিত্রও দর্শনীয়। হালদার বাড়ির কালীপুজোয় কিছু প্রাচীন প্রথা আজও বজায় আছে। পুজো শুরুর মুহূর্তে বাড়ির সব বৈদ্যুতিক আলো নিভিয়ে মণ্ডপ এবং সমস্ত বাড়িতে মোমবাতি জ্বেলে দেওয়া হয়। সে এক অভাবনীয় মায়াবী পরিবেশ, চাক্ষুষ না করলে অনুভব করা যায় না। আগে পশুবলির প্রথা থাকলেও ১৯৪৬ সাল থেকে বলি বন্ধ হয়ে গেছে। তার পরিবর্তে হয় আখ, শশা ও চালকুমড়ো বলি। পুরনো রীতি মেনে মশালের আলোয় সম্পন্ন হয় বলিদান পর্ব। দেবীকে অন্নভোগ দেওয়া হয় না। তার বদলে দেওয়া হয় লুচি, পঞ্চব্যঞ্জন ও মিষ্টি। সংকল্প হয় বাড়ির বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষের নামে।

শোনা যায়, আগে কালী প্রতিমার জিহ্বা সমান উচ্চতা পর্যন্ত দশ মণ চিনির নৈবেদ্য দেওয়া হতো। এখন দেওয়া হয় দুই মণ। তবে এক মণ দশ সের চালের নৈবেদ্য আজও দেবীকে নিবেদন করা হয়। কোনও দেবোত্তর সম্পত্তি নেই। যৌথ পরিবারে সবাই মিলে পুজোর দায়িত্ব পালন করেন।

বাহ্যিক আড়ম্বর না থাকলেও হালদার বাড়ির পুজোয় নিষ্ঠা, ভক্তি ও আন্তরিকতার অভাব নেই। হালদার বাড়ির ঐতিহ্যময় 'দক্ষিণাকালী' মাতাকে দর্শন করতে বহু মানুষের সমাগম হয়।

এই প্রতিবেদককে তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করেছেন হালদার পরিবারের অষ্টম প্রজন্মের সদস্য বরুণ হালদার। ▮

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

PIONEER®
EXERCISE BOOK

Manufacturer of Exercise Book
& Office Stationery

PIONEER PAPER CO.

74, Beliaghata Main Road, Kolkata 700 010 India. Phone: +91 33 2570 4152 / 2573 0556, Fax +91 33 2573 2596
Email: pioneerpaperco@gmail.com, www.pioneerpaper.co

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

সবার প্রিয়

বিল্লদা®

চানাচুর

BILLADA CHANACHUR
KALIKAPUR, BOLPUR, BIRBHUM, WB
Tel.: 03463 252447, Mob.: 9434306796

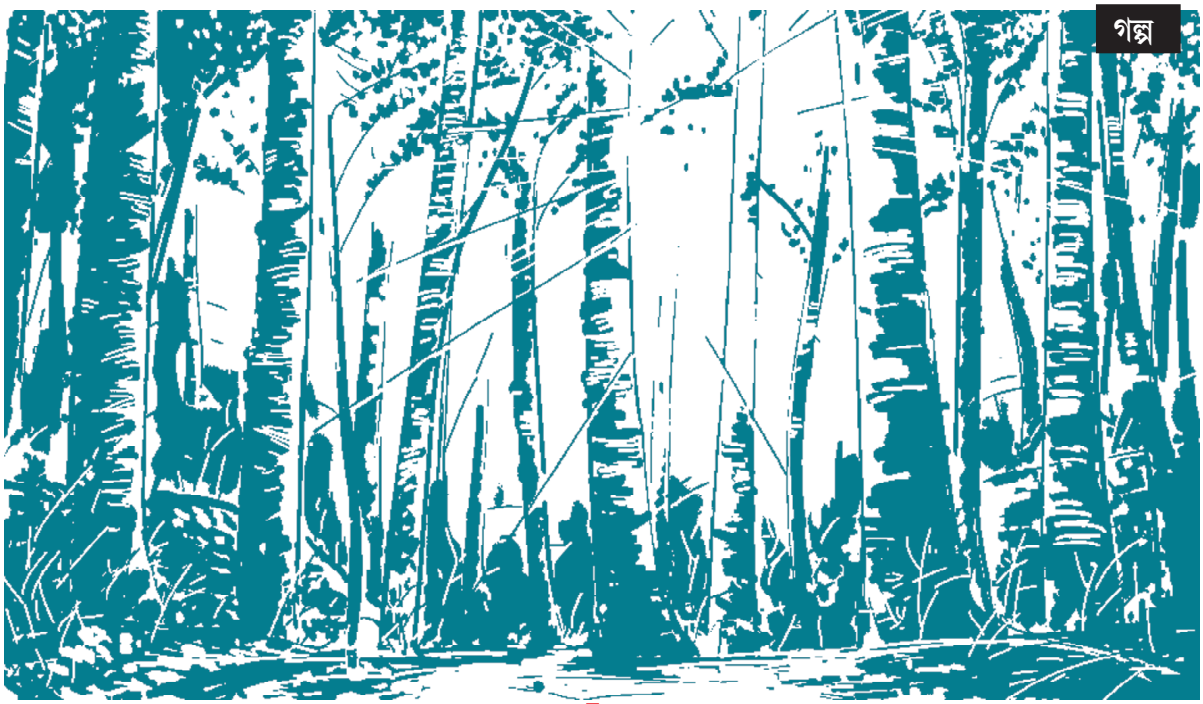

মার্ডারার

সন্দীপ চক্রবর্তী

'একদিন এখান থেকে আমি পালাব।' দূরে আকশের দিকে তাকিয়ে পিনু কথাগুলো বলল।

দুর্গা কী একটা বুনো ফল খোসা ছাড়িয়ে খাবার উদ্‌যোগ করছিল। থমকালো মুহূর্তের জন্য। সে ওড়িশার মেয়ে। কিন্তু ভালো বাংলা বলতে পারে। এর আগেও সে পিনুর মুখে পালানোর কথা শুনেছে। শুনে তার বুকের রক্ত হিম হয়ে গেছে। কিন্তু অনেকবার বুঝিয়েও সে পিনুকে নিরস্ত করতে পারেনি। তাই আজ আর ধৈর্য রাখতে না পেরে বলল, 'ফের যদি ওই কথা তোর মুখে শুনি তো খুন করে ফেলব।'

'কর না। এখানে আমি বেঁচে আছি নাকি? মাওবাদী ক্যাম্পে কেউ বেঁচে থাকে? তুইও কি বেঁচে আছিস? তোর বাঁচতে ইচ্ছে করে না দুর্গা?' পিনু দম নেবার জন্য থামল। ঘন জঙ্গলের মাথার ওপর শরতের নীল আকাশ। পশ্চিমবঙ্গে এখন দুর্গাপুজোর প্রস্তুতি চলছে। দু' বছর পিনু পুজো দেখেনি। কলকাতায় তাদের বাড়ির কাছেই পুজো হয়। বলতে গেলে বাড়িরই পুজো। তার মা বোন কাকিমারা পুজোর ফল কাটেন। নৈবেদ্য সাজান। বিজয়ার দিন সিঁদুর খেলেন। সে যে কী আনন্দের সময় না দেখলে বিশ্বাস হয় না।

চোখ বুজে ফেলল পিনু। আবছায়া অন্ধকারে কত মুখ, কত স্মৃতি। একুশ বছরের জীবন তো আর খুব ছোটো নয়। কিন্তু কোনও বন্ধু না, আত্মীয় না— হাজার মুখের ভিড় সরিয়ে ভেসে উঠলেন মা দুর্গা। ভাসিয়ে আনলেন ঢাকের শব্দ। আর মায়ের গলা, 'আর কতক্ষণ ঘুমোবি পিনু! স্নান করবি না? অঞ্জলির সময় তো হয়ে গেল।' অসহ্য অস্থিরতায় পিনু বিড়বিড় করে বলল, 'এই খুনোখুনির জীবন আমার আর ভালো লাগছে না। এভাবে নিরীহ মানুষগুলোকে খুন করে কোনওদিন বিপ্লব হবে না। সব বাজে কথা।'

কথাটা দুর্গাও মানে। কিন্তু একবার মাওবাদী জঙ্গি দলে ঢুকলে কেউ কি পালাতে পারে? পিনুর কাছে গিয়ে দুর্গা বলল, 'অবুঝ হোস না। কথা শোন। পালাতে গিয়ে গণেশ মাহাতোর কী দশা হয়েছিল তুই কি ভুলে গেছিস?'

'গণেশের কপাল ফুটো করে দিয়েছিল শয়তানগুলো। আমারও দেবে। দিক। অন্তত এই নরকযন্ত্রণা থেকে তো মুক্তি পাব।'

চুপ করে গেল দুর্গা। চাপা একটা কান্না গুমরে উঠল বুকের ভেতর। ক্যাম্পে অনেক ছেলে আছে। কিন্তু পিনু সবার থেকে আলাদা। অমন একমাথা অবিন্যস্ত চুল, ভাসা ভাসা চোখ, সুঠাম গড়ন— হাতে একটা বাঁশি ধরিয়ে দিলেই কেষ্টঠাকুর। বৈষ্ণব বাড়ির মেয়ে দুর্গা। তার ওপর আঠারো বছর বয়েস। তার কেবলই মনে হয় পিনুর বুকে মুখ গুঁজে দিতে পারলে পৃথিবীর কোনও ভয় আর তাকে স্পর্শ করতে পারবে না। একেই ভালোবাসা বলে কি না দুর্গা জানে না। কিন্তু পিনুর কাছে এলে একটা সুখী গৃহকোণের কথা ভাবতে তার ভালো লাগে।

নিজের ভাবনায় ডুবে গিয়েছিল দুর্গা। নিদারুণ একটা আতঙ্ক পাক খাচ্ছিল তার বুকের ভেতর। পালাতে গিয়ে পিনু যদি মরে যায় তাহলে তার ঘর বাঁধার স্বপ্নটাও মরে যাবে। অস্থির হয়ে উঠল দুর্গা। বলতে চাইল, 'পালালে দু'জনে একসঙ্গে পালাব। মরলে একসঙ্গে মরব।' কিন্তু বলা হলো না। তার আগেই পাশে পড়ে থাকা রাইফেলটা নিয়ে উঠে দাঁড়াল পিনু, 'চলি রে। আমাকে এখন ডুংরিটোলায় যেতে হবে। সুখদেব মাঝির বাড়িতে। সামনের সপ্তাহে কম্যান্ডার আসছে। শুনেছিস তো?'

কম্যান্ডার কৃষ্ণন রাও অন্ধ্রপ্রদেশের লোক। মাঝে মাঝে ঝাড়খণ্ডের এই ক্যাম্পে আসে। এবার আসছে প্রায় ছ'মাস পর। দুর্গা খবরটা শুনেছে। ঘাড় নাড়ল। পিনু আর দাঁড়াল না। হনহন করে হেঁটে জঙ্গলের গভীরে মিলিয়ে গেল।

বেলা যত বাড়ছে রোদের তাপও তত

বাড়ছে। বেশিক্ষণ বাইরে থাকলে গা পুড়ে যায়। প্রথম প্রথম দুর্গার কষ্ট হতো। এখন অভ্যেস হয়ে গেছে।

এরকম একটা জীবন যে তার কোনওদিন হতে পারে দুর্গা স্বপ্নেও ভাবেনি। কটক থেকে চল্লিশ কিলোমিটার দূরে দাসপুর বেশ বর্ধিষ্ণু গ্রাম। দুর্গা সেখানকার এক বিত্তশালী পরিবারের মেয়ে। হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করে কলেজে ভর্তি হয়েছিল। একদিন কলেজ থেকে বাড়ি ফেরার পথে তাকে কিডন্যাপ করা হয়। উদ্দেশ্য মোটা মুক্তিপণ আদায় করা। দুর্গার বাবা টাকা দিয়েছিলেন কিন্তু কৃষ্ণন রাও তাকে ছাড়েনি। লোকটা অসম্ভব ধূর্ত। এক জায়গায় বেশিদিন থাকে না। তাই পুলিশও তার নাগাল পায় না।

এই ক্যাম্পে দুর্গা ছাড়া আরও দুটো মেয়ে আছে। লতা আর রানি। লতার বাড়ি পুরুলিয়ায় আর রানির ছত্তিশগড়ে। দুর্গা ফেরা মাত্র লতা ডাকল, 'এই দুর্গা! তোর ভাগ্য তো খুলে গেল।'

ভাগ্য খোলার বিবরণটা লতা বেশ খোলসা করেই দিল। কৃষ্ণন রাওয়ের নজর পড়েছে দুর্গার ওপর। আগে দ্রৌপদী মুর্মু নামের একটা সাঁওতাল মেয়ে ছিল লোকটার ছায়াসঙ্গিনী। কমরেডরা বলত সেক্রেটারি, আসলে রক্ষিতা। বছরখানেক আগে দ্রৌপদী নিউমোনিয়ায় মারা যায়। দ্রৌপদীর জায়গায় দুর্গাকে রাখার প্রস্তাব দিয়েছে স্বয়ং কৃষ্ণন রাও।

লতা বলল, 'দেখিস, আমাদের যেন ভুলে যাসনি!'

দুর্গার চোখে অন্ধকার। শরীরটা পাথরের মতো ভারী। ষড়যন্ত্রটা এখন সে ধরতে পারছে। ক্যাম্পে তাকে বিশেষ কোনও কাজকর্ম দেওয়া হয়নি। অপারেশনেও রাখা হয় না। বলা হয়েছিল কাকে কী কাজ দেওয়া হবে সেটা সেন্ট্রাল কমিটি ঠিক করে। যতদিন না সেন্ট্রাল কমিটির কাছ থেকে কোনও নির্দেশ আসে দুর্গা এই ভাবেই থাকবে। কৃষ্ণন রাওয়ের বিছানায় পাঠানো হবে বলেই তাকে এতদিন ছেড়ে রাখা হয়েছে। মুক্তিপণের টাকা নিয়েও ফিরিয়ে দেওয়া হয়নি।

কম্যান্ডার কৃষ্ণন রাওকে দেখেছে দুর্গা। বিকৃতকাম পুরুষ। অন্ধ্রপ্রদেশে দুটো বউ আছে। তাছাড়া প্রতিটি ক্যাম্পে একজন করে রক্ষিতা। ঘরের কোণে তক্তপোশের ওপর লুটিয়ে পড়ল দুর্গা। মুহূর্তের জন্য চোখের সামনে ভেসে উঠল পিনুর মুখ। কিন্তু থাকল না। একবার দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল।

।। ২ ।।

শোলের গব্বর সিংয়ের মতো পায়চারি করছিল ভানুভাই। রাগে গনগন করছে মুখটা। রাগ সুখদেব মাঝির ওপর। তিনদিন আগে লোকটাকে টাকার কথা বলা হয়েছে। অথচ এখনও টাকা এসে পৌঁছয়নি।

পিনু মাইন রেজিমেন্টের সদস্য। সে জানে টাকাটা কেন দরকার। কাশ্মীরের হিজবুল মুজাহিদিনের হাত ঘুরে এক বিরাট অস্ত্রভাণ্ডার এই ক্যাম্পে আসছে। কম্যান্ডার নিজে ডিলটা ফাইনাল করবে। মাওবাদী জঙ্গিদের টাকার অভাব নেই। বিদেশ থেকে কোটি কোটি টাকা আসে। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের ভয় দেখিয়েও প্রচুর টাকা তোলা হয়। সুতরাং সুখদেব টাকা না দিলেও কিছু আটকাবে না। কিন্তু মাওবাদী ক্যাম্পের সেকেন্ড ম্যান ভানুভাইয়ের নির্দেশ অমান্য করা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। তার শাস্তি সুখদেবকে পেতেই হবে।

পায়চারি থামিয়ে ভানুভাই পিনুর দিকে ঘুরল, 'লেটার তুমনে কিসকো দিয়া থা কমরেড?'

'সুখদেবকোহী দিয়া হ্যায়।'

'ঠিক হ্যায়। মার দো উসে।'

মাইন রেজিমেন্টের সদস্যরা আকাশের দিকে বন্দুক উঁচিয়ে হুংকার দিল, 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ! লং লিভ কম্যান্ডার!'

রাত আটটা নাগাদ চারজনের একটা দল ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে গেল।

মাওবাদীরা যার কাছ থেকে যখন সাহায্য নেয় প্রয়োজনে তাকে মারার ভাবনা তখনই ভেবে রাখে। কারও শক্তি এবং দুর্বলতা ভালোভাবে যাচাই না করে তার সঙ্গে যোগাযোগ করা হয় না। সুখদেবের দুর্বলতাও ভানুভাই জানে। সুখদেব সারাদিন ব্যবসার কাজে চরকিপাক খায়। সন্ধ্যেবেলায় বাড়ি ফিরে মদের বোতল খুলে বসে। কাজেই তাকে মারার জন্য সন্ধ্যের পর যাওয়াই ভালো।

বাধা দেওয়া তো অনেক দূরের ব্যাপার সুখদেবের উঠে দাঁড়ানোর ক্ষমতাই ছিল না। বিনা বাধায় ওর কপালে গুলি করল কার্তিক ওরাওঁ। সুখদেবের বউয়েরও একই দশা হলো। সমস্যা বাধল তারপর। সুখদেবের চার বছরের ছেলে অভিমন্যু ভয় পেয়ে জড়িয়ে ধরল পিনুকে। কার্তিক বলল, 'ওকে দেওয়ালের সামনে দাঁড় করিয়ে দে পিনু।'

কার্তিক ভানুভাইয়ের পেয়ারের লোক। পিনু জানে সেটা। বেচাল দেখলে ক্যাম্পে ফিরে সাতকাহন করে লাগাবে। তারপর ক্যাঙ্গারু কোর্ট বসবে। বিচারের নামে প্রহসন হবে। শেষে পিনুকে মেরে কোনও পাহাড়ি নদীর জলে ভাসিয়ে দেওয়া হবে।... না, পিনু এখন এত বড়ো ঝুঁকি নিতে পারবে না। সে একটা বড়ো মিশনের পরিকল্পনা করেছে। তাতে দেশের মঙ্গল, সকলের মঙ্গল। ছেলেটার মাথায় হাত রেখে পিনু বলল, 'বাচ্চাটাকে ছেড়ে দাও কার্তিকদা। এইটুকু বাচ্চা আমাদের কী ক্ষতি করবে?'

'বড়ো হয়ে বাপের মতো গদ্দার হবে।'

কার্তিকের ইশারায় একজন অভিমন্যুকে টেনেহিঁচড়ে দেওয়ালের সামনে দাঁড় করিয়ে দিল। ফায়ার করল কার্তিক। পিনু সভয়ে দেখল অভিমন্যুর চৌচির হয়ে যাওয়া মাথা থেকে খানিকটা ঘিলু ছিটকে বেরিয়ে আছড়ে পড়ল দেওয়ালে।

বিবমিষায় মুখ ফিরিয়ে নিল পিনু। কিন্তু কিছু বলল না। তাকে অনেকদূর যেতে হবে। মাওবাদীদের এই দুর্গ ধ্বংস করতে হবে। বেঁচে থাকতে হবে তার জন্য। তাই সুখদেবের বাড়িতে লুটপাট শেষ হবার পর সে নির্দ্বিধায় গলা মেলায় কার্তিক ওরাওঁয়ের সঙ্গে, 'লং লিভ মাওইজম! লং লিভ কম্যান্ডার!'

পরের দিন সকালে পিনুকে ডেকে পাঠাল ভানুভাই। মাঝারি সাইজের একটা ঘর। দেওয়ালে কার্লমার্কস আর মাও জে দঙের ছবি। ছবির নীচে লেখা, 'প্রতিবিপ্লবীরা বিপ্লবের শত্রু। ওদের দমন করতে না পারলে বিপ্লব সফল হবে না।'

'আমাকে ডেকেছিলেন কমরেড?'

ভানুভাই ডায়েরিতে কিছু একটা লিখছিল। লেখা থামিয়ে বলল, 'সেন্ট্রাল কমিটি কা অর্ডার আ গয়া। কমরেড দুর্গা কম্যান্ডার কি সেক্রেটারি বনেগি। তুম ইয়ে খবর আভি কমরেড দুর্গা তক পঁহুছা দো।'

হতভম্ব হয়ে গেল পিনু। বুকের কাছে মায়াবী এক জলপ্রপাতের শব্দ। দুর্গা ওর বন্ধু। দুর্গা ওর মন খারাপের সঙ্গী। এই মনুষ্যত্বহীন অরণ্যে দু' বছর কাটিয়ে দেবার পরও পিনু দুর্গার চোখের দিকে তাকিয়ে অনেক দূরের এক মেঠো পথের ডাক শুনতে পায়। বড়ো ভালো লাগে শিশির-ভেজা সবুজ ঘাসে ঢাকা সেই পথে হাঁটতে। ভালোবাসতে ইচ্ছে করে

দুর্গাকে। কতবার সে কথাটা দুর্গাকে বলতে চেয়েছে। পারেনি। বাধা দিয়েছে বিবেক। প্রশ্ন তুলেছে, যার হাতে সাতজন পুলিশকর্মীর রক্তের দাগ তার কি এসব ভাবনা সাজে? কিন্তু এখন পিনু কী করবে? কম্যান্ডারের সেক্রেটারি হওয়ার অর্থ জেনে শুনে নরখাদককে আলিঙ্গন করা। সেটা কিছুতেই হতে পারে না।

মেয়েদের থাকার জায়গা কিছুটা দূরে। পিনু সেদিকে গেল না। এই সময় দুর্গা জঙ্গলের একটা বিশেষ জায়গায় থাকে। পিনুরও এখন ওখানেই থাকার কথা। ভানুভাই ডাকল বলে যেতে পারেনি।

দুর্গা একটা ঝাঁকড়া জাম গাছের নীচে বসেছিল। সে যে কাল সারারাত ঘুমোয়নি তার চিহ্ন চোখেমুখে স্পষ্ট। পিনু কাছে গিয়ে নরম গলায় ডাকল, 'দুর্গা!'

'তুই যা বলতে এসেছিস আমি জানি। লতা কালকেই আমায় বলেছে।'

পিনু অবাক হয়ে বলল, 'লতা বলেছে! ও কোথা থেকে জানল?'

দুর্গা কিছু বলল না। চেয়ে রইল দূরে একটা পাতাঝরা গাছের দিকে। জঙ্গলের এই অংশ অস্বাভাবিক নির্জন। বড়ো জন্তুজানোয়ার এদিকে খুব একটা আসে না। আসে শুধু অগুনতি পাখি। তিতিরের ঝাঁকটা খেলা থামিয়ে উড়ে যেতেই পিনু হাত রাখল দুর্গার কাঁধে। ভালোবাসার স্পর্শ মেয়েরা খুব ভালো চেনে, অঝোর কান্নায় ভেঙে পড়ল দুর্গা। পিনুর বুকে মুখ গুঁজে বলল,'আমাকে তুই বাঁচা পিনু।'

দূর থেকে ভেসে আসছে গুলির শব্দ। ক্যাম্পে নতুন আসা ছেলেরা প্র্যাকটিস করছে। পিনু বলল, 'যা বলব করতে পারবি?'

'কী করতে হবে বল?'

'পরশু কম্যান্ডার আসছে। ওইদিন রাতে আমরা পালাব।'

অন্যদিনের মতো দুর্গা ভয় পেল না। শুধু কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করল, 'পারবি?'

পিনু হেসে বলল, 'পারব। আমি একটা প্ল্যান করেছি। তোকে যথাসময়ে সব বলব। ঠিক যে ভাবে বলব সেই ভাবে কাজগুলো করে যাবি। নিজের বুদ্ধি লাগাবি না। ঈশ্বরের ওপর ভরসা রাখ। আমরা নিশ্চয়ই পারব।'

।। ৩ ।।

কম্যান্ডার ক্যাম্পে এলে ক্লাস নেওয়ার ধুম পড়ে যায়। তাছাড়া দিনভর চলে মনোবল বাড়ানোর ট্রেনিং। এবারও তার ব্যতিক্রম হলো না। মাও-জে-দঙের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ওপর দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে কৃষ্ণন রাও বলল, 'হিজবুল মুজাহিদিন কা নাম আপলোগোনে তো শুনা হি হোগা কমরেড? ইসবার ওহ্ লোগ অ্যায়সা এক্সপ্লোসিভ হামে দেঙ্গে জিস কে জরিয়ে আপ পুলিশ তো কেয়া ইন্ডিয়ান আর্মি কো ভি উডা সকতে হো।'

দেড়শো মাওবাদী কম্যান্ডো সমস্বরে বলে উঠল, 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ! লং লিভ কম্যান্ডার!'

কৃষ্ণন রাও বলল, 'ইয়াদ রাখনা ইয়ে কান্ট্রি তুমহারা নেহি। ইয়ে গভর্নমেন্ট তুমহারা নেহি। যব তক হামলোগ ইস দেশ পর কবজা নেহি কর লেতা হামারা গেরিলাওয়ার জারি রহেগা। হামলোগো সে টকরানে কে লিয়ে কোই মাঈ কা লাল বচেগা নেহি কমরেড। হম জরুর কামিয়াব হোঙ্গে।'

'ইনকিলাব জিন্দাবাদ! লং লিভ মাওইজম!'

বারোটার সময় লাঞ্চব্রেক। খেতে খেতে পিনু ওর পরিকল্পনার কথা ভাবছিল। কম্যান্ডার আজ সারাদিন নানারকম মিটিংয়ে ব্যস্ত থাকবে। দুর্গাকে রাত ন'টা নাগাদ কম্যান্ডারের ঘরে পৌঁছে যাওয়ার কথা বলেছে ভানুভাই। ওই সময় থেকেই শুরু হবে পিনুদের অপারেশন। গতকাল দুর্গার সঙ্গে যাবতীয় আলোচনা সেরে নিয়েছে পিনু। বুঝিয়ে দিয়েছে ওকে কী করতে হবে। এখন মা দুর্গার কৃপা হলে ওদের কেউ আর আটকাতে পারবে না।

ভানুভাইয়ের সঙ্গে কৃষ্ণন রাওয়ের রুদ্ধদ্বার বৈঠক চলছে। ক্যাম্পের মেজাজ একটু ঢিলেঢালা। সবার অলক্ষ্যে পিনু ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে পড়ল। জঙ্গলের পথ ধরে চলে গেল ডুংরিটোলায়।

দোসাদপাড়া পেরিয়ে বাঁদিকে ঘুরলে ছত্রিটোলা। সেখানে একটা ছোট্ট টিলার আড়ালে খাপড়ার চালের ঘর। ভেতরে মনোহর সিংহ পিনুর জন্যেই অপেক্ষা করছিল। গিরিডি স্টেশনে মনোহরের চায়ের দোকান আছে। কিন্তু সেটা ওর মুখোশ। লোকটা আসলে পুলিশের ইনফর্মার। মাস তিনেক আগে মনোহরের সঙ্গে পিনুর আলাপ। মনোহর গিরিডির লোক হলেও একসময় ছত্তিশগড়ের মাওবাদী স্কোয়াডে ছিল। পরে পালায়। আত্মসমর্পণ করে। জেলও খেটেছে সাত বছর। এখন গিরিডিতে ফিরে পুলিশের খোচর হয়েছে। বস্তুত মনোহর সাহায্য না করলে পিনু পালাবার কথা ভাবতে পারত না। শেষ মুহূর্তে কোথাও কোনও ফাঁক থেকে গেল কিনা জানার জন্য পিনু বলল, 'সব ঠিক হ্যায় তো মনোহরভাই?'

'ফিকর করনে কি কোই বাত নহি পিনুভাই। ম্যায়নে সারে ইন্তেজাম কর দিয়া। কাল সুবহ্ পুলিশ জঙ্গল মে রেইড করেগি। জঙ্গল মে আনেযানে কা সারে রাস্তে মে ভি নাকাবন্দি কর দিয়া যায়েগা। ওহ্ পাকিস্তানি লোগ চাহে জিস রাস্তে সে আয়ে, জিন্দা ওয়াপস নহি যায়েগা। এসপি সাহাব খুদ নিগরানি মে হ্যায়।'

পাখির মতো হালকা শরীরে পিনু ক্যাম্পে ফিরল। দু' বছর আগে এক মাওবাদী রিক্রুটার তাকে চাকরির টোপ দিয়ে এখানে নিয়ে এসেছিল। তারপর থেকে প্রতিদিন সে এখান থেকে পালাবার কথা ভেবেছে। আজ এই ক্যাম্পে তার শেষ দিন। কথাটা ভাবামাত্র তার চোখ জলে ভরে গেল।

কৃষ্ণন রাও মেশিনরুমে বসে কাজ করছিল। এখান থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন ওয়েবসাইট হ্যাক করে তথ্য চুরি করা হয়। এবার সেন্ট্রাল কমিটির সদস্য সদাশিব রেড্ডি কৃষ্ণন রাওয়ের সঙ্গে এসেছে। সদাশিবের আর একটি পরিচয় সে একজন আইটি বিশেষজ্ঞ।

চার ঘণ্টা ধরে সদাশিব রেড্ডি একটার পর একটা সাইট ঘেঁটে চলেছে। উদ্দেশ্য, কাল হিজবুল মুজাহিদিনের যে দুই জিহাদি আসছে তাদের সম্বন্ধে সরকার কিছু জানতে পারল কিনা সেটা আগেভাগে জেনে নেওয়া। কিন্তু হোম মিনিস্ট্রির কোনও সাইটেই কোনও তথ্য নেই। সদাশিব রেড্ডি বলল, 'সম্ভবত গভর্নমেন্ট কালকের অপারেশনের ব্যাপারে কিছুই জানে না। জানলে আমাদের জ্যামারে হিট করত।'

'আর ইউ শিয়োর?' কৃষ্ণন রাও জিজ্ঞাসা করল।

'ইয়েস। আপনি পাকিস্তানি হেড কোয়ার্টারে জানিয়ে দিতে পারেন।'

বার্তা চলে গেল।

কৃষ্ণন রাও খুব খুশি। ভারতবর্ষে মাওবাদী আন্দোলন গোড়া থেকেই চীনা এজেন্টদের নির্দেশে পরিচালিত হচ্ছে। পাকিস্তানের সঙ্গে বন্ধুত্ব হবার পর তারা এখন চায় ভারতে

ইসলামিক সন্ত্রাসবাদ এবং মাও জঙ্গিবাদ হাত ধরাধরি করে চলুক। এ ব্যাপারে কৃষ্ণন রাওকে বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

মেশিনরুম থেকে বেরিয়ে কৃষ্ণন রাও ফিরে চলল তার নিজের আস্তানার দিকে। মাথার ওপর শরতের তারাভরা আকাশ। চাঁদও উঠেছে চমৎকার। কৃষ্ণন রাওয়ের শরীরমন চনমনে হয়ে উঠল। ন'টা বেজে গেছে। দুর্গা সম্ভবত এসে গেছে। সারাদিনের হাড়ভাঙা খাটুনির পর একটু-আধটু ফুর্তির ব্যবস্থা না রাখলে গেরিলা যোদ্ধার কাঠিন্য নষ্ট হয়ে যায়।

ক্যাম্পে ইলেকট্রিসিটি নেই। সাধারণ মাওবাদী কম্যান্ডোদের ঘরে রাতে হ্যারিকেন লণ্ঠন জ্বলে। কম্যান্ডারের ঘরে হ্যাজাক লণ্ঠন। ঘরের সামনে একজন একজন সশস্ত্র প্রহরী। কৃষ্ণন রাও বলল, 'দুর্গা কাঁহা হ্যায়?'

'ওহ্ তো আ গয়ি। অন্দর মে হ্যায়।'

'ঠিক হ্যায়। তুম আভি যা সকতে হো।'

কৃষ্ণন রাও ঘরে ঢুকে দেখল কোণের দিকে একটা চেয়ারে দুর্গা বসে আছে। জায়গাটা আলোআঁধারি মতো। কৃষ্ণন রাও কাছে গিয়ে বলল, 'তুম আ গয়ি দুর্গা! আজ ম্যায় বহোৎ খুশ হুঁ।'

কোন কথার উত্তরে কী বলতে হবে পিনু পাখি পড়ানোর মতো করে বুঝিয়ে দিয়েছে। দুর্গা নম্রস্বরে বলল, 'ম্যাঁয় ভি বহুৎ খুশ হুঁ। আপনে মুঝে সেক্রেটারি চুনা ইয়ে মেরি খুশনসিবি হ্যায়।'

কৃষ্ণন রাও অধৈর্য হয়ে বলল, 'তব দের কিস বাত কি? আও দুর্গা, অওর পাশ আও।'

কৃষ্ণন রাওয়ের নিঃশ্বাসের হলকায় পুড়ে গেল দুর্গার সর্বাঙ্গ। মনের কোণে জেগে উঠল ভয়। কিন্তু আজ তার ভয় পেলে চলবে না। পিনু বলে দিয়েছে, সারা দেশ অপেক্ষা করছে দুর্গার জন্য। কৃষ্ণন রাওকে ঘুম পাড়ানোর কাজটা তাকেই করতে হবে। ভোররাতে পুলিশ এসে লোকটাকে যেন জীবন্ত ধরতে পারে। না হলে এই কৃষ্ণন রাও দেশের ক্ষতি তো করবেই, সেই সঙ্গে দুর্গার মতো বহু মেয়েরও সর্বনাশ করবে।

'ইতনি জলদি কেয়া হ্যায় কম্যান্ডার? ম্যাঁয় তো সারি জিন্দেগি কে লিয়ে আপকে পাশ আ গয়ি। প্যাহলে আপ ফ্রেশ হো কর আইয়ে। তব তক ম্যাঁয় আপ কে লিয়ে ড্রিঙ্ক বানাতি হুঁ।'

কৃষ্ণন রাও নিশ্চিন্ত মনে বাথরুমের দিকে চলে গেল। দুর্গা হুইস্কির সঙ্গে সোডা মিশিয়ে রেডি করে ফেলল। একটা প্লেটে ঢালল বাদাম। তারপর হ্যাজাক লণ্ঠনের আলোটা কমিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল কৃষ্ণন রাওয়ের জন্য।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে কৃষ্ণন রাও বলল, 'ইয়ে কেয়া দুর্গা? লাইট ইতনি কম কিঁউ?'

'উজালে সে মুঝে শরম আতি হ্যায় কম্যান্ডার। ইসি লিয়ে রোশনি কম কর দিয়া। লেকিন আপকো আগর—'

কৃষ্ণন রাও কিছু বলল না। লোলুপ দৃষ্টিতে দুর্গাকে দেখতে দেখতে গ্লাসে চুমুক দিল। ঘরের ভেতর সীমাহীন নৈঃশব্দ্য। দুর্গা এত সহজে রাজি হয়ে যাবে কৃষ্ণন রাও স্বপ্নেও ভাবেনি। বরং ভেবেছিল মেয়েটাকে বিছানায় টেনে নিয়ে যেতে বিস্তর ঝামেলা পোহাতে হবে। এমনকী দরকারে ক্লোরোফর্ম করার কথাও ভেবে রেখেছিল। বিছানায় সঙ্গিনী বেহুঁশ বা মৃত যাই হোক, কৃষ্ণন রাওয়ের তাতে কিছু আসে যায় না।

নেশা ধীরে ধীরে জমে উঠছিল। এক মুঠো বাদাম মুখে ফেলে কৃষ্ণন রাও হাত বাড়িয়ে ধরতে চাইল দুর্গাকে। কিন্তু পারল না। হঠাৎ চোখের সামনে সব অন্ধকার। মুহূর্তের মধ্যে সোফায় এলিয়ে পড়ল কৃষ্ণন রাও।

উঠে দাঁড়াল দুর্গা। মুখে তার বিচিত্র হাসি। যে শরীরমন পিনুর প্রতি উৎসর্গীকৃত তাকে কলুষিত করতে চেয়েছিল লোকটা। উচিত শিক্ষা পেয়েছে। কৃষ্ণন রাওয়ের হেলে পড়া মাথাটা পা দিয়ে সোজা করে দুর্গা নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

।। ৪ ।।

ক্যাম্পের পশ্চিমদিকে পাহাড়। এদিকের জঙ্গল একটু অগভীর। কিন্তু পাহাড় থাকায় মাওবাদী কম্যান্ডোরা নিরাপদ মনে করে। তত কঠিন পাহারাও থাকে না।

দুর্গা এগিয়ে গেল পাহাড়ের দিকে। পাকদণ্ডী বেয়ে উঠে গেল কিছুটা। সামনে বড়ো বড়ো পাথরের আড়ালে একটা চাতাল মতো। যেখানে দাঁড়িয়ে দুর্গা পেঁচার ডাক ডাকল। তিনবার ডাকার পর পিনু একটা গুহা থেকে বেরিয়ে এল। দুর্গা এতক্ষণ পাহাড়প্রমাণ সংযমের আড়ালে তার যাবতীয় আবেগ-উচ্ছ্বাস বন্দি করে রেখেছিল। আর পারল না। ঝাঁপিয়ে পড়ল পিনুর বুকে।

মধ্যরাতের জঙ্গলের মতো ভয়ংকর জায়গা আর কিছু হয় না। রিজার্ভ ফরেস্ট এখান থেকে অনেকটা দূরে হলেও রাতের জঙ্গলকে বিশ্বাস নেই। তাছাড়া, এই দুধগোয়ানি পাহাড় ক্যাম্প থেকে বেশি দুরেও নয়। পিনু বলল, 'আমাদের এবার যেতে হবে দুর্গা।'

পাহাড় থেকে নেমে ওরা সোয়ানির দিকে চলল। রাতচরা পাখি আর ঝিঁঝির ডাক ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই। দুর্গা নীচু গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'আমরা কোথায় যাচ্ছি রে পিনু?'

'ডুংরিটোলা। ওখানে মনোহর সিংহ দুটো বাইক রেডি রাখবে। বাইকে করে আমরা যাব গিরিডির এসপি সাহেবের বাংলোয়।'

'ওখানে কেন?'

'আমি স্যারেন্ডার করব দুর্গা। দেশের প্রতি যে অন্যায় করেছি তার শাস্তি ভোগ না করে আমি ফিরতে চাই না। তবে তোর কথা আলাদা। তুই কোনও অপরাধ করিসনি। এসপি সাহেব কথা দিয়েছেন তোকে তোর বাড়িতে পৌঁছে দেবেন।'

'কী করে জানলি আমি কোনও অপরাধ করিনি?'

'আমি জানি। তোর মতো সুন্দর মেয়ে খুনখারাবির মতো কাজ করতেই পারে না।'

দুর্গা হঠাৎ পিনুকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'তুই খুব বোকা! কিচ্ছু বুঝিস না।'

মনোহর সিংহ করিতকর্মা লোক। দুটো বাইক নিয়ে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে যাওয়া সরকারি রাস্তায় অপেক্ষা করছিল। দুর্গাকে পিছনে বসিয়ে পিনু বাইকে স্টার্ট দিল। অন্যটায় একা মনোহর সিংহ। ফরেস্টগার্ডেরা রাতে সরকারি রাস্তায় টহল দেয়। তাই মাওবাদী জঙ্গিরা চট করে এদিকে আসে না। বাইক দুটো ঝড়ের বেগে সরকারি রাস্তা ধরে ছুটে চলল গিরিডির দিকে।

ভোর হতে আর বিশেষ দেরি নেই। ইতিমধ্যেই পুব আকশে আলোর কয়েকটা অস্পষ্ট আঁকিবুকি ফুটে উঠেছে। সেদিকে তাকিয়ে দুর্গার মন আশ্চর্য এক খুশিতে ভরে গেল। আজ আর তার কোনও ভয় নেই। ভাবনাও নেই। পিনু যে ক্যাম্প থেকে পালিয়ে পুলিশের কাছে স্যারেন্ডার করবে সেটা সে অনুমান করতে পেরেছিল। দেশকে যে ভালোবাসে তার কাছে এটাই তো স্বাভাবিক। শাস্তি বাদ দিয়ে কি শুদ্ধি হয়? আর শাস্তিই বা কী এমন! দুর্গা জানে যে সব জঙ্গি স্যারেন্ডার করে রাজসাক্ষী হয় দেশের আইন তাদের

ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখে। পিনুরও বড়োজোর চার-পাঁচ বছরের জেল হবে। তারপর? দুর্গার চোখের সামনে ভেসে উঠল একটা ঘরের ছবি। পিনুর সঙ্গে সংসার করার কল্পনায় সে বুঁদ হয়ে গেল।

আর ঠিক তখনই মনোহর সিংহ বলল, 'হামলোগ আ গয়ে পিনুভাই। ওহ্ পিলাবালা মকান হি এসপি সাহাব কা বাংলো হ্যায়।'

সাড়ে ছ'টা বেজে গেছে। এসপি সুরিন্দর চৌবে ড্রইংরুমে বসে কফি খাচ্ছিলেন। মনোহর সিংহ পরিচয় করিয়ে দিল। সুরিন্দর চৌবে বললেন, 'ওয়েল ডান পিনু! ওয়েল ডান দুর্গা! আজ তোমরা যা করলে তার জন্য তোমাদের ইতিহাসে জায়গা পাওয়া উচিত।'

পিনু লজ্জা পেয়ে বলল, 'না স্যার আমি বিশেষ কিছু করিনি। যা করবার দুর্গা করেছে। কৃষ্ণন রাওয়ের ঘরে ঢুকে ওর মদে ঘুমের ওষুধ মেশানো তো সহজ কাজ নয়। যে ডোজের ঘুমের ওষুধ দেওয়া হয়েছে তাতে দশ-বারো ঘণ্টার আগে লোকটার ঘুম ভাঙবে না। আপনারা সহজেই ওকে জীবন্ত ধরতে পারবেন।'

দুর্গা কিছু বলল না। সুরিন্দর চৌবে ওর সাহসের প্রশংসা করলেন। পিনু বলল, 'দুর্গা সম্বন্ধে আমি তো স্যার আপনাকে সব কথাই জানিয়েছি। ওকে যদি বাড়ি ফেরার ব্যবস্থা করে দেন খুব ভালো হয়।'

'আমি সব ব্যবস্থা করে দিয়েছি পিনু। ওর বাবাকে টেলিগ্রামও করে দেওয়া হবে আজ।'

এই সময় সুরিন্দর চৌবের মোবাইল ফোন বেজে উঠল। গিরিডি থানার ওসি গোপাল ঠাকুরের ফোন। তিনি জানালেন ভোররাতের অপারেশন সাকসেসফুল। মাওবাদীদের পুরো গ্যাং ধরা পড়েছে। হিজবুল মুজাহিদিনের দুই জঙ্গিকেও হাইওয়েতে অ্যারেস্ট করেছে পুলিশ। খারাপ খবর একটাই। কৃষ্ণন রাওকে জীবন্ত ধরা যায়নি। সম্ভবত ঘুমের ওষুধের ঘোর কেটে গিয়েছিল। অতর্কিত আক্রমণে পুলিশ ক্যাম্প ঘিরে ফেলেছে শুনে লোকটা সায়নাডাইড ক্যাপসুল খেয়ে আত্মহত্যা করেছে।

পিনু চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল, 'অসম্ভব! এ হতে পারে না স্যার। এত তাড়াতাড়ি লোকটার ঘুম ভাঙতেই পারে না। —দুর্গা, অ্যাই দুর্গা, তুই ডোজ কমিয়ে দিসনি তো?'

দুর্গা প্যান্টের পকেট থেকে একটা কাগজের পুরিয়া বের করে পিনুর দিকে এগিয়ে দিল। মুখে কিছু বলল না।

পিনু ক্ষিপ্র হাতে পুরিয়াটা খুলে বলল, 'একী! সব ওষুধই তো পড়ে আছে। আমি কিছু বুঝতে পারছি না দুর্গা।'

দুর্গার মনে হাজারো দ্বন্দ্বের টানাপড়েন। বাইরের সত্যকে বাইরের লোকের কাছে স্বীকার করতে তার বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই। কিন্তু যে সত্যে শুধু দুর্গা আর পিনুর অধিকার তার কথা সে কোনমুখে বাইরের পৃথিবীকে বলবে? অথচ আজ তার ভিতরবাহির সব একাকার হয়ে গেছে। এমনভাবে মিলেমিশে গেছে যে একটাকে বাদ দিয়ে অন্যটাকে চেনার কোনও উপায়ই নেই।

সুরিন্দর চৌবে এগিয়ে এলেন, 'তদন্তের স্বার্থে আমার সব কথা জানা দরকার দুর্গা। তুমি কৃষ্ণন রাওকে শেষ কী অবস্থায় দেখেছিল?'

দুর্গা শ্বাস গোপন করে বলল, 'আমি কৃষ্ণন রাওকে খুন করেছি স্যার। পিনু আমাকে ওই পুরিয়াটা দিয়েছিল। প্ল্যান অনুযায়ী কৃষ্ণন রাওয়ের মদের গ্লাসে পুরিয়ার সব ওষুধ আমার মিশিয়ে দেওয়ার কথা। কিন্তু আমি তা করিনি। আমি বাদামের মধ্যে পিনুর পটাসিয়াম সায়ানাডাইড ক্যাপসুলটা মিশিয়ে দিয়েছিলাম! হ্যাজাক লণ্ঠনের আলো কম করা ছিল। লোকটা বুঝতে পারেনি।'

পিনু চেনে বাঁধা লকেট খুলে দেখল ক্যাপসুল নেই। কী হয়েছে বুঝতে তার অসুবিধে হলো না। পরশুদিন দুর্গা লকেটটা দেখতে চেয়েছিল। বিন্দুমাত্র সন্দেহ করেনি পিনু। একে তো দুর্গা শান্তশিষ্ট স্বভাবের মেয়ে। পিনুকে নিয়ে তার সদাই ভয়। তাছাড়া, ক্যাম্পে নতুন যারা আসে ডেথ স্কোয়াডের মেম্বরদের গলায় বাঁধা পটাশিয়াম সায়নাডাইড ক্যাপসুল নিয়ে তাদের কৌতূহল থাকে। পিনু ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারেনি নিছক কৌতূহল নয় রীতিমতো প্ল্যান করে সেদিন লকেটটা দেখতে চেয়েছিল দুর্গা। তারপর কোনও এক ফাঁকে লকেট খুলে সে ক্যাপসুলটা হস্তগত করে।

সুরিন্দর চৌবে সব কথা শুনে বললেন, 'কিন্তু এ কাজ তুমি কেন করলে দুর্গা? তুমি তো জানো কৃষ্ণন রাওকে জীবন্ত ধরতে পারলে আমরা অনেক তথ্য সংগ্রহ করতে পারতাম।'

দুর্গার চোখ জলে ভরে গেল। এই সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। এবার তাকে স্বীকার করতেই হবে। পিনুর দিকে আঙুল তুলে সে বলল, 'সব ওই পিনুর জন্য স্যার। না, ওর কোনও দোষ নেই। সব দোষ আমার। কৃষ্ণন রাওয়ের জন্য আমার বাবা আজ সর্বস্বান্ত। আমার দিদির হয়তো বিয়েই হবে না। এসব আমি মেনে নিয়েছিলাম। এমনকী লোকটা যে আমাকে ভোগ করতে চেয়েছিল, তাও আমি মনে রাখিনি। কিন্তু—

'কিন্তু কী দুর্গা?'

'কিন্তু পিনু সেদিন বলল কোনও ক্রাইম করিনি বলে আমায় বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হবে আর ও দেশের আইনের দেওয়া শাস্তি মাথায় তুলে নিয়ে চলে যাবে জেলে— সেদিন আমি সহ্য করতে পারিনি। আমি ওকে ভালোবাসি স্যার। ওর সঙ্গে সংসার করার স্বপ্ন দেখি। আমাকে আপনারা ওর কাছ থেকে আলাদা করে দিতে পারেন না। তার জন্য যদি মার্ডার করতে হয় আমি হাজারবার করব। আমায় অ্যারেস্ট করুন স্যার। শাস্তি দিন। কিন্তু দোহাই আপনার, পিনুর কাছ থেকে আমায় দূরে থাকতে বলবেন না।'

কান্নায় ভেঙে পড়ল দুর্গা। সস্নেহে তার পিঠে হাত রাখলেন সুরিন্দর চৌবে। পুলিশের চাকরি করে চুল পাকিয়ে ফেললেও দুর্গার মতো কাউকে দেখেননি। সত্যিই ভারতবর্ষ বিচিত্র দেশ। আজও এদেশের মেয়েরা ভালোবাসার জন্য যে কোনও কষ্ট স্বীকার করতে পারে।

পরের দিন পিনু আর দুর্গাকে রাজসাক্ষী ঘোষণা করল পুলিশ। ওদের জবানবন্দিতে উঠে এল চমকপ্রদ কিছু তথ্য। ধরা পড়ল আরও চারজন মাওবাদী নেতা। আদালতের বিচারে পাঁচ বছর করে জেল হলো দু'জনের।

জেল থেকে বেরিয়ে পিনু আর দুর্গা একদিন এসপি সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে এল। ইতিমধ্যে সুরিন্দর চৌবে অবসর নিয়েছেন। দু'জনকে দেখে বললেন, 'কী ব্যাপার পিনুবাবু? দু'জনে একসঙ্গে যখন, তখন নিশ্চয়ই কোনও সুখবর আছে।

পিনু বলল, 'আমরা বিয়ে করছি স্যার। আপনাকে আসতেই হবে।'

'মেনি কনগ্র্যাচুলেশনস। নিশ্চয়ই যাব।'

অবশেষে সেই শুভদিন এলো। এসপি সাহেব নবদম্পতিকে আশীর্বাদ করলেন। দুর্গাকে বললেন, 'পিনুর কাছে থাকার জন্য আর যেন কাউকে মার্ডার করো না।'

দুর্গা চোখ নামিয়ে নিল। কিছু বলল না। ■

বীর যোদ্ধা চক্র বিশোই

ওড়িশার বনবাসী ক্ষেত্র ফুলবনি জেলার পার্বত্য কন্দ জনজাতিদের বীরত্বের কাহিনি আজও লোকেদের মুখে মুখে ফেরে। তাদের সেনাপতি ছিলেন বনবাসী বীর যোদ্ধা চক্র বিশোই। তিনি ১৮২৩ সালে গঞ্জাম জেলার চক্রগড় গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর অপ্রতিম বলিদানের শৌর্যকাহিনি বোধমণ্ডলের রমণীয় উপত্যকায় চমকে উঠে হঠাৎ কোথায় হারিয়ে গেল কোনও চিহ্ন না রেখে তা খুবই আশ্চর্যের বিষয়। তিনি শুধু যোদ্ধাই ছিলেন না, একই সঙ্গে ছিলেন সমাজ সংস্কারকও। কন্দ জনজাতির মধ্যে বীভৎস নরবলি প্রথাকে সমাপ্ত করার শ্রেয় বহুলাংশে তাঁরই প্রাপ্য। তাঁর অন্তর্ধান হবার পর ওই এলাকায় খ্রিস্টধর্মের অভিযান আবার চালু হয়ে যায়।

১৮০৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত উৎকল প্রদেশের অধিকাংশ এলাকা ব্রিটিশ শাসনের অধীনে এসে যায়। কিন্তু কেবলমাত্র ফুলবনি এলাকাই তার বাইরে থেকে প্রায় আশি বছর ইংরেজ সেনাদের পর্যুদস্ত করে রেখেছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে এখানে ভঞ্জরাজারা শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। তাঁরা শাসনকার্যের সুবিধের জন্য নিজ রাজ্যকে ২৪ টি ভাগে বিভক্ত করেন। প্রতিটি ভাগকে মুট্‌ঠে বলা হতো। প্রত্যেক মুট্‌ঠের প্রধানকে বিশোই বলা হতো। এই বিশোইদের মধ্যেই একজন ছিলেন চক্র বিশোই। তিনি এবং তাঁর কাকা ধওরা বিশোই ঘুমসরের রাজা ধনুর্জয় ভঞ্জদেবের সেনাবাহিনীতে সেনাপতির পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

ঘুমসর রাজ্যের সেনাবাহিনীর সবাই ছিলেন বনবাসী বীর কন্দ উপজাতির লোক। ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ব্রিটিশরা ফুলবনির কাছাকাছি সমস্ত এলাকায় আধিপত্য কায়েম করে। তারপর তারা পাহাড়ি রাজ্যের দিকে হাত বাড়ায়। এই এলাকায় তাদের প্রবল প্রতিরোধের মুখোমুখি হতে হয়। ঘুমসরের মতো একটি পাহাড়ি রাজ্যের বনবাসীরা চক্র

বিশোই ও ধওরা বিশোইয়ের নেতৃত্বে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ব্রিটিশ সেনাদের যেভাবে দু'বছর আটকে রেখেছিল তা গর্বের ইতিহাস। ব্রিটিশ সেনাপতি সেলের ভাষায় ইংরেজদের এখানে 'ওড়িশার কঠিনতম লড়াই' লড়তে হয়েছিল। এই পার্বত্য রাজ্যের বনবাসীরা যেকোনও মূল্যে ব্রিটিশ আধিপত্য অস্বীকার করেছিল।

ক্রমাগত যুদ্ধে বনবাসী বীরদের শক্তিক্ষয় হতে লাগল। তখন উদয়গিরিতে সমস্ত মুট্‌ঠে প্রধান ও বনবাসী যোদ্ধাদের সঙ্গে রাজা এক সভায় মিলিত হলেন। সেখানে সকলে অস্ত্র দিয়ে নিজেদের বুড়ো আঙুল চিরে কপালে রক্ততিলক লাগিয়ে সঙ্কল্প গ্রহণ করল যে, শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ করা হবে। এই ঘটনার জন্য সেই স্থানটির নাম হয়ে যায় টীকাবালী।

ইতিমধ্যে রাজা ধনুর্জয় ভঞ্জদেব শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। তাতেও বীর বনবাসীরা থেমে না থেকে গেরিলাযুদ্ধ চালু রাখলেন। বাজপাখির মতো ইংরেজ সেনাদের ওপড় অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে হামলা চালানো শুরু হলো। এই আক্রমণে ব্রিটিশ সেনা এগুতেই পারছিল না। চক্র বিশোইয়ের শক্তি ও সেনা পরিচালনার কথা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। আশেপাশের ছোটো ছোটো রাজ্যের রাজারাও তাদের সহযোগিতায় এগিয়ে এলেন। ধীরে ধীরে পুরো সমাজ তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালো। ১৮৪৭ সালে মেজর ব্যাক ফার্সন প্রতারণা করে রাজাকে বন্দি করলে চক্র বিশোইয়ের গেরিলা বাহিনি ইংরেজদের ছাউনিতে হামলা চালিয়ে সকলের চোখের সামনে রাজাকে ছিনিয়ে আনে।

১৮৫৪ সালে ম্যাকেনিলকে ফুলবনির স্বাধীনতা সংগ্রাম দমন করার জন্য পাঠানো হলো। কিন্তু চক্র বিশোইয়ের বীর বনবাসী যোদ্ধারা ইংরেজসেনার রক্তে অস্ত্রের গোড্ডা গিরিপথকে রঞ্জিত করেছিল। একজন ইংরেজ সেনাও সেদিন পালাতে পারেনি। ১৮৮০ সাল পর্যন্ত এরকম যুদ্ধ চলতে থাকল।

তারপর হঠাৎ একদিন উধাও হয়ে গেলেন চক্র বিশোই। দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই বনবাসী বীরের আর কোনও সন্ধান পাওয়া যায়নি। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর মতো আজও তিনি ফুলবনির বনবাসীদের মধ্যে লোককথা ও গানের মধ্যে রয়ে গেছেন। আজও মায়েরা তাদের সন্তানদের চক্র বিশোইয়ের শৌর্যবীর্যর কাহিনি শোনায় এবং তাঁর মতো পরাক্রমশালী জীবন গঠন করতে প্রেরণা দিয়ে থাকে।

শক্তিপদ ঠাকুর

ভারতের পথে পথে

শ্রীরঙ্গম

ভারতবর্ষের ১০৮ বিষ্ণুতীর্থের অন্যতম শ্রীরঙ্গম। ত্রিচি থেকে ৭ কিলোমিটার উত্তরে কাবেরী ও তার শাখা কোল্লিডাম নদী ঘেরা দ্বীপে ২৫০ হেক্টর জুড়ে দক্ষিণ ভারতের বৃহত্তম দক্ষিণমুখী শ্রীরঙ্গনাথস্বামী মন্দির। কুণ্ডলী পাকানো শেষনাগের ওপর অনন্তশয়নে শায়িত বিষ্ণু পূজিত হন রঙ্গনাথস্বামীরূপে। ওঁ আকৃতি মন্দিরটি ত্রয়োদশ শতকে নির্মিত। ৭ টি প্রাচীরে ঘেরা ভাস্কর্যময় ৭ টি গোপুরম্ পেরিয়ে, ৭ চত্বর ডিঙিয়ে মূল মন্দির। মন্দিরের ৭২ মিটার উঁচু রাজাগোপুরম্‌টি দক্ষিণ ভারতের সবচেয়ে উঁচু গোপুরম্। মন্দিরের গম্বুজটি সোনায় মোড়া। চূড়োয় সোনার বিষ্ণু, সোনার তালগাছ, চার বেদের প্রতীক স্বর্ণকলস রয়েছে। ষোড়শ শতকে তৈরি ৯৪০ পিলারের কল্যাণমণ্ডপে প্রতি ডিসেম্বরের শুক্লপক্ষের একাদশীতে ন'দিন ব্যাপী বৈকুণ্ঠ একাদশী উৎসব পালিত হয়। এসময় সারা দেশ থেকে তীর্থযাত্রীরা এখানে ভিড় করেন।

জানো কি?

পশ্চিমবঙ্গে প্রথম (পুরুষ)

- জ্ঞানপীঠ ও আকাদেমি পুরস্কার—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।
- রবীন্দ্র পুরস্কার—নীহার রঞ্জন রায়।
- শেরিফ—দিগম্বর রায়।
- ভারতরত্ন—ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়।
- নির্বাচন কমিশনার—সুকুমার সেন।
- সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি—বিজন কুমার মুখোপাধ্যায়।
- রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর—পরেশ ভট্টাচার্য।
- সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

ভালো কথা

আমার নাটকের অভিজ্ঞতা

এবার দুর্গাপূজাতে আমি চতুর্থী, ষষ্ঠী, সপ্তমী ও অষ্টমীতে নাটক করেছি। নাটকের নাম 'চিচিঙ্গে অ্যান্ড কোং'। চতুর্থীতে সিংটির ড্রামাট্রিক ক্লাবে, ষষ্ঠীর দিনে আমাদের বাড়ির কিছু দূরে বেলেড় মাঠে, সপ্তমীর দিনে পাশের গ্রাম দক্ষিণ সিংটিতে এবং অষ্টমীর দিনে আমাদের বাড়ির দুর্গাপূজাতে। এটি হাসির নাটক। সব জায়গায় দর্শকরা খুবই হেসেছে। আমরাও খুব মজা পেয়েছি। নাটকে ছোটদাদা, বনু, প্রীতি, দিশা, সৌম্য, দাদা, শুভশ্রী, সৌজন্যা ও আমি অভিনয় করছি। আমি মামার ভূমিকায় অভিনয় করেছি। এই প্রথম আমি স্টেজে নাটক করলাম। আগে নাচ ও গান করেছি, তাই সাহসটা একটু ছিলই। এবার নাটকে অভিনয় করে সাহসটা বেড়ে গেল।

স্বাত্ত্বিকা ভট্টাচার্য, চতুর্থ শ্রেণী, রাজাপুর, হাওড়া।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

ছোটদের কলমে

পূজার মজা

রাজা রায়, অষ্টম শ্রেণী, পুখুরিয়া, মালদা।

পুজোর মজা বড়ো মজা শুধুই শুধু পাওয়া
পড়াশুনার বালাই নেই কেউ করে না মানা।
শার্ট-প্যান্ট রাশি রাশি ধুতি দিলে পিসো
কী আনন্দ দু'জোড়া জুতো তাও দিলে মেসো।
এত সব পেয়ে ভাবি দরকার যে নেই এত
কিনতে যারা পারে না তাদের দিলে কেমন হতো।
তাইতো আমি পুজোর দিনে বিলিয়ে দিলাম সবই
পায়নি যারা পেল কিছু তাই আনন্দ পেলাম খুবই।

এই বিভাগে ছোটরা কবিতা লিখে পাঠাও

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : 8420240584
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584
E-mail : swastika5915@gmail.com
ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

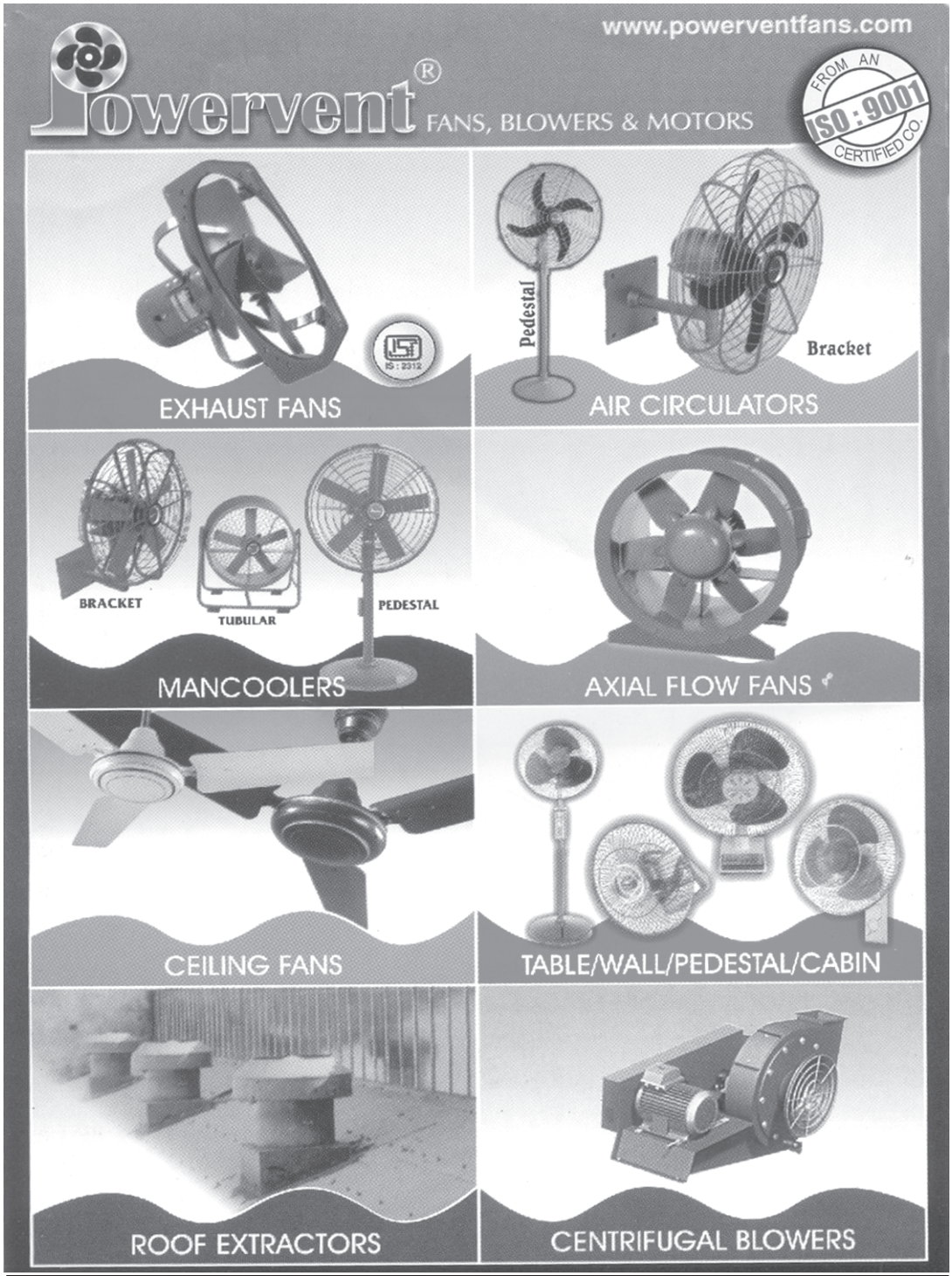

SHREE NURSING TIMBER & ELECTRIC STORES

PODDAR COURT

18, RABINDRA SARANI, GATE NO. 4, 2ND FLOOR, ROOM NO. 7 & 8, KOLKATA - 700 001

PHONE : 2235-5210, 2235-2109, FAX : 91-33-2225-3373

e-mail : sntescal@yahoo.com, SMART - 2386

একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্য 'স্ব' উৎসারিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ঃ মোহন ভাগবত

আজ আমরা পুণ্য বিজয়া দশমী উপলক্ষ্যে সমবেত হয়েছি। এবছর গুরু নানকদেবের ৫৫০ তম 'প্রকাশ পর্ব' শ্রদ্ধার সঙ্গে উদ্‌যাপিত হচ্ছে। যখন সমগ্র সমাজ ভারতবর্ষের চিরায়ত গৌরবময় ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত মহান সত্যগুলি ভুলে গিয়ে দুর্বল, পরাজিত ও বিভাজিত হয়ে পড়েছিল, যখন দেশবাসী শঠতা, মিথ্যাচার ও স্বার্থপরতার পঙ্কিল আবর্তে নিমজ্জিত ছিল, সীমান্ত লঙ্ঘন করে হানা দেওয়া অসহিষ্ণু বিদেশি শক্তির আগ্রাসন ও নির্মম নিষ্ঠুরতায় যখন দেশের মানুষের ত্রাহি ত্রাহি রব উঠেছিল, ঠিক সেই সময় শ্রীগুরু নানকদেব আত্মজাগরণের নতুন দিশা দেখিয়েছিলেন। নিজের জীবনবোধ দিয়ে তিনি বিভ্রান্ত, পথভ্রষ্ট দেশবাসীকে সময়োপযোগী আধ্যাত্মিক অভ্যাসের দ্বারা সমাজকে সংস্কারিত ও সঙ্ঘবদ্ধ করে নবচেতনা সঞ্চার করেছিলেন। তাঁরই সূচিত পরম্পরায় এদেশে দশজন মহান শিখগুরুর ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল যা ভারতবাসীকে হীনম্মন্যতা ও মানসিক দৈন্য থেকে মুক্ত করেছিল।

এবছর মহাত্মা গান্ধীর সার্ধশত জন্মবার্ষিকী পালন করা হচ্ছে। তিনিও দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে সত্যানুসারী রাজনৈতিক ভিত্তিস্থাপন ও অহিংসার দিশা দেখিয়েছিলেন। এই সমস্ত প্রচেষ্টার ফল হিসেবে দেশের সাধারণ মানুষ আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসে ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিল। আজ থেকে একশো বছর আগে রাউলাট আইনের বিরুদ্ধে জালিয়ানওয়ালাবাগে সমবেত কয়েকশত নিরস্ত্র জনতাকে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলে জেনারেল ডায়ারের নির্দেশে নির্দয়ভাবে গুলি চালানো হয়েছিল। সেইসব শহিদের আত্মত্যাগ আজও আমাদের মনোবল সুদৃঢ় করে।

এবছর এ সমস্ত প্রাসঙ্গিক ঘটনাবলীর উল্লেখ খুবই জরুরি, কারণ যদিও স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর থেকে গত ৭১ বছর ধরে আমাদের দেশ বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য স্বীকৃতি লাভ করেছে, তবু আমাদের সর্বব্যাপী জাতীয় জীবনের বহু ক্ষেত্রে আরও অগ্রসর হতে হবে। আমাদের দেশ বিশ্বের দরবারে আরও সুসংগঠিত, শক্তিশালী ও বৈভবসম্পন্ন হয়ে উঠলে যে অশুভ শক্তির স্বার্থ বিঘ্নিত হয় এবং যাদের অশুভ চক্রান্ত ভেস্তে যায়, তারা কিন্তু এই অপকর্ম থেকে সহজে বিরত হয় না। বরং নিত্যনতুন বাধাবিঘ্ন সৃষ্টি করার ফন্দি

ফঃ ৬

আঁটতে থাকে। আমরা অনেক বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে এসেছি। আমাদের পুর্বপুরুষদের প্রদর্শিত পথেই আমরা ঈপ্সিত লক্ষ্য অর্জনে সমর্থ হব এবং তাঁদের উদাহরণ সামনে রেখে জীবনের গৌরবময় আদর্শগুলি সমাজজীবনে রূপায়িত করব যা সত্য, পবিত্রতা, ত্যাগ, প্রেম ও তপস্যার ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত।

জাতীয় নিরাপত্তা

যে কোনো দেশের কাছে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, সে দেশের সীমান্তের সুরক্ষা ও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা। কারণ দেশের উন্নতি ও অগ্রগতির অনুকূল পরিবেশ বজায় রাখতে এই সুরক্ষা নিশ্চিত হওয়া প্রযোজন। সুরক্ষা সংক্রান্ত আমাদের দেশের ভাবনা অন্যদের অবগত করানো এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের গতিপ্রকৃতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে অন্য রাষ্ট্রসমূহের সমর্থন আদায়ের প্রচেষ্টা অনেকাংশেই সফল হয়েছে। আমাদের সরকার, প্রশাসন এবং সামরিক বাহিনী প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের প্রতি কথায় ও কাজে শান্তিপূর্ণ ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার বার্তা যেমন দিয়েছে তেমনি জাতীয় নিরাপত্তার প্রয়োজনে যখনই দৃঢ় ও সমর্থ পদক্ষেপের প্রয়োজন হয়েছে তাও তারা গ্রহণ করেছে।

এই প্রসঙ্গে আমাদের সেনাবাহিনী ও অন্যান্য নিরাপত্তা সংস্থার মনোবল বৃদ্ধির জন্য আরও উন্নত ও আধুনিক প্রযুক্তিতে বলীয়ান করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পৃথিবীর মানচিত্রে ভারতের গৌরব বৃদ্ধির এটি অন্যতম কারণ।

একই সঙ্গে বিভিন্ন নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ান ও তাঁদের পরিবারবর্গের দৈনন্দিন জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগসুবিধা বৃদ্ধি করা অত্যন্ত জরুরি। এক্ষেত্রে সরকারের বেশ কিছু পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে প্রশংসাযোগ্য। ভাবতে হবে কত শীঘ্র এই পদক্ষেপগুলি রূপায়িত করা যায়। এই কল্যাণমূলক প্রকল্পগুলি রূপায়ণের জন্য সরকার ও প্রশাসনের যেমন দায়িত্ব রয়েছে, তেমনি সমাজেরও রয়েছে, একথা প্রত্যেক দেশবাসীর মনে রাখা প্রয়োজন। একথা অস্বীকার করা যায় না যে, দেশের নিরাপত্তার জন্য সীমান্তে বা অভ্যন্তরে যখন যেখানে প্রয়োজন সেখানেই আমাদের ভাইয়েরা লড়াই করছেন নিজেদের সামাজিক সুরক্ষা বা পরিবারের পরোয়া না করে। সীমান্তের ওপারে সরকার পরিবর্তন হওয়া সত্ত্বেও আমাদের দেশের পশ্চিম সীমান্ত এলাকায় বিশেষ করে জম্মু-কাশ্মীর ও পঞ্জাব সীমান্তের ওপার থেকে প্ররোচনামূলক কার্যকলাপ কোনও অংশে কমেনি, এসব কমবে বা বন্ধ হবে আশা করাও হয়নি।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির নিরিখে আমাদের জলসীমা সুরক্ষার বিষয়টিও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে পড়েছে। ভারতের উপকূলবর্তী এলাকায় দেশের মূল ভূখণ্ড থেকে বিভিন্ন দূরত্বে শত শত দ্বীপ অবস্থিত। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ-সহ এ সমস্ত দ্বীপ সামরিক দৃষ্টিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অবস্থিত। নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে এই সমস্ত স্থানের দেখভাল, সুযোগসুবিধা ও শক্তিবৃদ্ধির কাজগুলি যুদ্ধকালীন তৎপরতায় করতে হবে। জলসীমা সুরক্ষার কাজে নিযুক্ত নৌসেনা ও অন্যান্য বাহিনীর মধ্যে সমন্বয়ের কাজটি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে করতে হবে। স্থল ও জল সীমাবর্তী এলাকার বাসিন্দারা বিচিত্র পরিস্থিতিতে সমস্ত প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করে চলেছেন। যদি এই সমস্ত মানুষের কল্যাণের জন্য কিছু করা যায় তাহলে তাঁরাও অনুপ্রবেশ,চোরাচালানের মতো সমস্যা মোকাবিলায় সহায়ক হতে পারেন। সরকার ও সমাজ সকলের প্রচেষ্টা থাকতে হবে যাতে ত্রাণসামগ্রী, শিক্ষা,স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থানের সুবিধা তাঁদের কাছে প্রয়োজনের সময় পৌঁছে দেওয়া যায় এবং তাঁদের মধ্যে শৌর্য, দেশপ্রেম এবং সদ্‌গুণের বিকাশ ঘটানো যায়। অন্যান্য দেশের সঙ্গে সামগ্রী আদান-প্রদানের প্রক্রিয়া চলতে থাকলেও প্রতিরক্ষা সামগ্রী উৎপাদনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ আত্মনির্ভর হতে না পারলে কোনও দেশের নিরাপত্তা সম্পূর্ণ সুনিশ্চিত হতে পারে না। এই লক্ষ্যে পৌঁছনোর প্রচেষ্টাকে আরও গতিশীল করতে হবে।

অভ্যন্তরীণ সুরক্ষা

সীমান্ত সুরক্ষার মতোই সমান গুরুত্বপূর্ণ হলো অভ্যন্তরীণ সুরক্ষা। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলি এবং সামগ্রিক ভাবে প্রশাসনকেও শক্ত হাতে সমস্ত রকম হিংসাত্মক কার্যকলাপ যা দেশের অভ্যন্তরীণ বা বহিঃশত্রুর মদতে দেশের সার্বভৌমত্বকে বিপন্ন করে তুলেছে, তার মোকাবিলা করতে হবে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার সমূহ এবং পুলিশ ও আধাসামরিক বাহিনী সাফল্যের সঙ্গে এ ধরনের হিংসার মোকাবিলা করে চলেছে। এই অশুভ শক্তিগুলির ওপর তাদের প্রখর সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। কিন্তু এটা বাস্তব সত্য যে, এ ধরনের হিংসাত্মক কার্যকলাপে যারা অংশগ্রহণ করছে বহু ক্ষেত্রেই তারা আমাদেরই সমাজের সদস্য। এর মূল কারণ হলো অশিক্ষা, অনুন্নয়ন, নাগরিক পরিষেবার ঘাটতি, বেকারত্ব, অসাম্য, শোষণ, ভেদভাব, সহমর্মিতার অভাব, সর্বোপরি একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্য অপরিহার্য সামাজিক সংস্কারের অভাব। এই অবস্থার নিরসন করতে সরকার ও প্রশাসনকে নিশ্চিতভাবে তাদের ভূমিকা পালন করতে হবে। কিন্তু এই গুরুদায়িত্ব সবথেকে বেশি পালন করতে হবে সমাজকে। সমস্ত রকম ভেদাভেদ ও অসাম্যকে দূর করে সমাজে সদিচ্ছা ও আন্তরিকতার পরিবেশ নির্মাণ করতে হবে এবং সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া সকলকে সম্মান ও স্নেহ দিয়ে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করতে হবে। সমাজ জীবনে এই পরিবর্তন বাস্তবায়িত করতে চাইলে প্রথমে নিজের ভাবনাচিন্তাকে স্বচ্ছ করে তুলতে হবে এবং আচরণও তদনুযায়ী করতে হবে। সমাজের সমস্ত অংশের মানুষকে নিজের আত্মীয় হিসেবে গণ্য করে তাদের সুখ-দুঃখের অংশীদার হতে হবে।

তথাকথিত অনুসূচিত জাতি ও জনজাতিদের উন্নতির জন্য যেসমস্ত প্রকল্প আছে সেগুলি যথা সময়ে এবং যথোপযুক্ত ভাবে রূপায়ণ করার জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলিকে আরও তৎপরতা, মানবিকতা ও দক্ষতা দেখাতে হবে। অভ্যন্তরীণ সুরক্ষার প্রথম প্রহরীর কাজটি করে পুলিশ বাহিনী। এই বাহিনীর ব্যবস্থা সংস্কারের কথা পুলিশ কমিশন বলেছে। অনেক বছরের পুরনো সেই সুপারিশগুলি কার্যকর করা জরুরি হয়ে পড়েছে।

উদ্বেগজনক প্রবণতা

দেশ পরিচালন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিবর্গ এবং সমগ্র সমাজকে সমাজের দুর্বল শ্রেণীর উন্নতি বিষয়ে যথেষ্ট আন্তরিকতা,

সংবেদনশীলতা, স্বচ্ছতা, শ্রদ্ধা ও দক্ষতা দেখাতে হবে। এর অন্যথা হলেই সমাজের বঞ্চিত, নিপীড়িত ও উপেক্ষিত মানুষদের মধ্যে সংশয়, সন্দেহ, বিচ্ছিন্নতাবোধ ও ক্ষোভের বীজ বপন করা সহজ হয়। পরিস্থিতির এই সুযোগ নিয়ে দেশবিরোধী শক্তি ও অপরাধচক্র এদের মধ্যে সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং এই মানুষদের দেশের বিরুদ্ধে গোলাবারুদ হিসেবে ব্যবহার করে। বিগত চার বছরে সমাজের মধ্যে ঘটে যাওয়া কিছু অবাঞ্ছিত ঘটনা, বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের নতুন-পুরনো সমস্যা ও নতুন-পুরনো দাবিদাওয়া নিয়ে যেসব আন্দোলন তাকে একটি বিশেষ রূপ দেওয়ার অপচেষ্টা চলছে। এটি একটি বিপজ্জনক প্রবণতার ইঙ্গিত দেয়। আসন্ন নির্বাচনের দিকে দৃষ্টি রেখে স্বার্থপর ক্ষমতালোলুপ শক্তি এই ধরনের আন্দোলনে মদত দিয়ে অশ্রদ্ধা, সংবিধানের প্রতি অবজ্ঞা, সামাজিক ঐক্য ইত্যাদি নষ্ট করতে চাইছে। দেখা যাচ্ছে, এসব সুযোগ কাজে লাগিয়ে, মানুষের ক্ষোভ উস্কে দিয়ে বিচ্ছিন্নতা, হিংসা, বিদ্বেষ, ঘৃণা সৃষ্টি করে জাতীয়তা বিরোধী মনোভাব তৈরির অপচেষ্টা চলছে। যেসব গোষ্ঠীর নেতা 'ভারত তেরে টুকরে হোঙ্গে'-র মতো স্লোগান দিয়েছিল, সাম্প্রতিক ঘটনা ও সংশ্লিষ্ট আন্দোলনেও তাঁদের অনেকেই উস্কানিমূলক ভাষণ দিয়ে নিজেদের উপস্থিতি জানান দিচ্ছেন।

যখন প্রত্যন্ত বনাঞ্চলে হিংসাত্মক কার্যকলাপ শক্ত হতে দমন করা হচ্ছে তখন এদের পৃষ্ঠপোষকরা 'শহুরে মাওবাদী' হিসেবে সেই হিংসাকে জিইয়ে রাখতে অনুঘটকের ভূমিকা নিচ্ছেন। প্রথমে ছোটো ছোটো গ্রুপ তৈরি করে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ছাত্রাবাসে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে একটা নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা হয়। তারপর ছোটোখাটো হিংসাত্মক ঘটনায় যুক্ত করে এদের হাতেখড়ি দেওয়া হয় এবং ক্রমশ এদের নৈরাজ্যবাদী করে তুলে আইনের শাসন ও সামাজিক বিধিনিষেধ লঙ্ঘন করার দুঃসাহসে উৎসাহ দেওয়া হয়। এ ধরনের হঠাৎ উগ্র আন্দোলনের ফলে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের যে নেতৃত্ব কম-বেশি সামাজিক প্রতিষ্ঠানে আস্থাশীল,তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন উঠে যায়। এই শহুরে মাওবাদীদের নতুন কৌশল হলো ছলে বলে একদল 'নব্য মাওবাদী' গড়ে তোলা, যারা অন্ধ সমর্থক হিসেবে লাগামছাড়া উগ্র কার্যকলাপে রত থাকবে। আর তাদের মদতদাতা বুদ্ধিজীবী ও অন্যরা সোশ্যাল মিডিয়া, বিভিন্ন মাধ্যম ও প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এই সব উগ্র আন্দোলনের সম্পর্কে মিথ্যা প্রচার করে নৈতিক সমর্থন ও মিথ্যাকে সত্য প্রমাণের চেষ্টা করবে। তাদের প্রচার ও বিশ্লেষণকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে বিদ্বেষমূলক ভাষা ব্যবহারেও এরা পিছপা হয় না। আর একটা নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে বিশিষ্ট নাগরিকের ভাবমূর্তি বজায় রাখে। দেশের শত্রপক্ষের সাহায্য নিয়ে দেশের বিরোধিতা করা এদের কৌশল হিসেবে গণ্য হয়। যদি সোশ্যাল মিডিয়ার বিভিন্ন তথ্য ও বিশ্লেষণের উৎস সম্পর্কে তদন্ত করা যায় তবে এই সত্য প্রকট হয়ে পড়ে। এই সমস্ত হিংসাত্মক ঘটনায় কোথাও না কোথাও জিহাদি বা উগ্রপন্থীদের সক্রিয় উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এই সমস্ত কিছু থেকে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যায় তা হলো, এটি একটি বৃহত্তর চক্রান্ত যার পিছনে রয়েছে দেশের ভিতরে থাকা দেশবিরোধী শক্তির সক্রিয় সাহায্য। সুতরাং এই বিপজ্জনক প্রবণতা শুধুমাত্র ক্ষমতার রাজনীতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকছে না, একটি সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি বা দল সচেতন ভাবে এবং সমাজের দুর্বলতর শ্রেণীর মানুষ যারা শোষণের জাঁতাকলে পিষ্ট তারা সবাই দেশবিরোধী শক্তির হাতের পুতুল হয়ে উঠছেন। তাদের গোলাবারুদে পরিণত হচ্ছেন। ঘৃণা ও বিদ্বেষের পরিবেশ তৈরি করে এক 'বৌদ্ধিক যুদ্ধ' জারি করা হয়েছে, যার লক্ষ্য হলো দেশের সামাজিক সৌহার্দ্য নষ্ট করা এবং অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আঘাত করা।

এই বিপজ্জনক প্রবণতা প্রতিরোধ করার জন্য সরকার ও প্রশাসনকে সতর্ক থাকতে হবে, যাতে এমন ঘটনা না ঘটে যার ফলে উপদ্রব সৃষ্টিকারী শক্তি ফয়দা না তুলতে পারে। একই সঙ্গে সেইসব দেশবিরোধী চক্রের ওপর কড়া নজর রাখতে হবে যাতে তারা কোনও অবাঞ্ছিত ঘটনা না ঘটাতে পারে। ক্রমশ যখন সমাজের সমর্থন কমে যাবে তখন এ ধরনের উপদ্রব সৃষ্টির ক্ষমতাও নষ্ট হয়ে যাবে। প্রশাসনকে গোপন তথ্য সংগ্রহের এমন পর্যাপ্ত পরিকাঠামো গড়ে তুলতে হবে যা অনেক বেশি প্রখর ও তৎপর হবে। জনকল্যাণমুখী প্রকল্পগুলির সুবিধা যাতে সমাজের সবথেকে পিছনের সারিতে থাকা মানুষটির কাছে দ্রুততার সঙ্গে পৌঁছে যায় তা নিশ্চিত করতে হবে। আইনের শাসন নিশ্চিত করতে কুশলতা ও দক্ষতার সঙ্গে কাজ করতে হবে। কিন্তু এই বিপজ্জনক পরিস্থিতি তখনই সম্পূর্ণ রূপে স্বাভাবিক হবে যখন সমাজের সমস্ত মানুষের মধ্যে শুভবুদ্ধির উদয় ঘটবে এবং ভাবের আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে আত্মীয়তা গড়ে উঠবে। বিভিন্ন মত-পথ,সম্প্রদায়-জাতি-উপজাতি, ভাষা-প্রান্ত সবই আমাদের দৃষ্টিতে ঐক্যের ভিন্নতর প্রকাশ মাত্র। কোনো বিশেষ সমস্যাকে নিজেদের সমস্যা হিসেবে গণ্য করে সমাজের সকলে বসে আলোচনার মাধ্যমে সমাধান খোঁজার চেষ্টা করতে হবে। নিয়মিত যোগাযোগ ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের মধ্যে দিয়ে এমন একটা পরিবেশ নির্মাণ করতে হবে যাতে সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় হয়। নিজেদের জীবনে সমাজিক অনুশাসন ও আইনের শাসন মেনে চলা অভ্যাস করতে হবে। এই প্রসঙ্গে সমস্ত নাগরিক ও নেতার ড. বাবাসাহেব আম্বেদকরের সেই বিখ্যাত ভাষণ স্মরণ করা প্রযোজন যেখানে তিনি বলেছেন (২৫ নভেম্বর, ১৯৪৯), 'দেশকে ন্যায়, সমতা ও স্বাধীনতার লক্ষ্য পূরণ করতে হলে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে সামাজিক স্বাধীনতার জন্য সমাজে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণের ব্যাপক প্রসার ঘটাতে হবে। এছাড়া গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এমনকী ব্যক্তিস্বাধীনতাও সুরক্ষিত থাকবে না। ব্রিটিশ শাসনকালে নিজেদের দাবি উত্থাপনের জন্য যে পদ্ধতি আমরা অবলম্বন করতাম স্বাধীনতার পর তা বাতিল করতে হবে। আমরা এখন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও অনুশাসন অনুযায়ী বৈধ পদ্ধতিই অবলম্বন করবো।' ভগিনী নিবেদিতাও দৈনন্দিন জীবনে নাগরিক সচেতনতাকে দেশপ্রেমের প্রকাশ হিসেবে গণ্য করেছেন।

পরিবারে সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা

দেশের স্বার্থসংক্রান্ত যে কোনো বিষয়ে রাজনৈতিক দল, প্রশাসন, বিচার ব্যবস্থা, স্থানীয় প্রশাসন, সামাজিক সংগঠন ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে ঐক্যের ভাব থাকলে তবেই সেই সমাজে বা দেশে স্থায়িত্ব, উন্নতি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত হতে পারে। এই সমস্ত সদ্‌গুণ শৈশব থেকেই পরিবার, বিদ্যালয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে নতুন প্রজন্মের মধ্যে সঞ্চারিত করতে হবে। আজকের দিনে পারিবারিক জীবন থেকে নতুন প্রজন্মের মানবিক গুণ ও চরিত্র গঠনের শিক্ষা পাওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। সামাজিক পরিবেশ বা বিদ্যালয়ের পাঠক্রমে মূল্যবোধের শিক্ষা আর ততটা গুরুত্ব পাচ্ছে না। নতুন শিক্ষানীতি প্রয়োগ করার সময় পার হয়ে যাচ্ছে। যদিও কিছু ব্যক্তি ও সংগঠন সামাজিক ও প্রশাসনিক স্তরে মূল্যবোধভিত্তিক পরিবর্তনের প্রয়াস চালাচ্ছেন। আমাদের গৃহ ও পরিবার স্বাভাবিকভাবেই এই কাজের সহায়ক। এটা দেখা আমাদের দায়িত্ব যে, নতুন প্রজন্মের মানসিক গঠনের সময় স্বাভাবিক আত্মীয়তার ভাব, পরিবার ও সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধ, বিবেকবোধ ইত্যাদি সদ্‌গুণের বিকাশ ঘটছে কি না। বিশ্বব্যাপী এই পরিবর্তনের সময় এই প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে যে, পরিবর্তিত সময়ে নতুন প্রজন্মের প্রতি একটু অতিরিক্ত মনোযোগ দিতে হবে। আজকের দিনে হাতের নাগালে নানা ধরনের গণমাধ্যম, বৈদ্যুতিন যন্ত্রাদি এবং নিত্যনতুন প্রযুক্তি ,যার মাধ্যমে বাছবিচার না করেই সমস্ত রকমের তথ্য সকলে পেয়ে যাচ্ছে। এর কোনটি ঠিক, কোনটি ভুল যাদের বিবেচনা করার ক্ষমতা নেই তারা আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়ছে। এ বিষয়ে আমাদের সতর্ক হতে হবে। এখানেই প্রয়োজন পারিবারিক মূল্যবোধের। নিজেদের উদাহরণ দিয়ে ভালোবাসার দ্বারা নতুন প্রজন্মের মধ্যে বিচার বিশ্লেষণের সামর্থ্য তৈরি করতে হবে। তারা যেন মুক্ত জগৎ থেকে যা কিছু ভালো তা গ্রহণ করতে পারে আর মূল্যবোধ যেন তাদের অশুভ শক্তির থেকে রক্ষা করতে পারে।

পারিবারিক অশান্তি, ঋণগ্রস্ততা, অনৈতিক আচরণ, পরিচিত জনের দ্বারাই বলাৎকার-ব্যভিচার, আত্মহত্যা এবং জাতিগত সংঘর্ষ ও বৈষম্যের ঘটনার মতো সংবাদগুলি অবশ্যই উদ্বেগের ও বেদনার। এসবের একমাত্র সমাধান হলো এক স্নেহছায়াময় পারিবারিক পরিবেশে সামাজিক পরিমণ্ডল গড়ে তোলা। এই কাজে সমাজের সমস্ত মানুষ বিশেষত সুধীজনকে এই লক্ষ্য সামনে রেখে কাজ করতে হবে।

সুসংহত চিন্তন

যাঁরা সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাঁদের সকলকে মনে রাখতে হবে যে, তাঁদের প্রতিটি কথা, কাজ ও ভাবনার মধ্যে যেন ব্যক্তি, সমাজ, পরিবার, মানবতা ও পরিবেশের প্রতি দায়বদ্ধতা থাকে। বিশ্বের কোথাও শুধুমাত্র আইনের শাসন ও শাস্তির ভয় দেখিয়ে শান্তিপূর্ণ সমৃদ্ধ সমাজজীবন গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি এবং হবেও না। সমাজের নীতিবোধের ফলস্বরূপ মানুষ সামাজিক আইনগুলি মেনে চলে। আর সমাজের নীতিবোধ গড়ে ওঠে পরম্পরাগত মূল্যবোধ দ্বারা। মূল্যবোধে দৃঢ় থেকেই আচারধর্মের সময়ানুকূল পরিবর্তন করা উচিত। প্রকৃত ও সম্পূর্ণ সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠিত করতে হলে চারটি বিষয়ের মেলবন্ধন ঘটাতে হবে -- (১) স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগত চাহিদা যা সামাজিকতা তৈরি করে। (২) নীতিবোধের দ্বারা প্রবৃত্তিগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে ইতিবাচক অভিমুখে চালিত করে সুখ ও সন্তুষ্টি লাভ। (৩) আইনি পদ্ধতি যা সমাজ ও পরিবারের নীতিভিত্তিক শৃঙ্খলা নিশ্চিত করে এবং (৩) মূল্যবোধের অনুভব যা এই সমস্তকে নির্ধারিত করে। এই সমস্ত বিবেচনা না করে এবং ধৈর্য সহকারে সমাজের মনস্তত্ত্ব উপযুক্তভাবে প্রস্তুত করতে না পারলে এগুলি অভ্যাসে পরিণত করা বা পরিবর্তিত সময়ে এক নতুন সামাজিক রচনা সৃষ্টি করা সম্ভব হবে না। সম্প্রতি শবরীমালা মন্দির সংক্রান্ত রায়দানের পর উদ্ভূত পরিস্থিতি এই ইঙ্গিতই দেয়। অনাদিকাল থেকে যে পরম্পরায় মানুষ অভ্যস্থ তা বিবেচনায় আনা হলো না। ধর্মীয় পরম্পরার সঙ্গে যুক্ত বিশিষ্ট জন কিংবা কোটি কোটি ভক্তের সঙ্গে কোনও কথা বলা হলো না। এমনকী মহিলাদের একটা বড়ো অংশ যারা এই নিয়মের সমর্থক তাদেরও কথা শোনা হলো না। আইনি সিদ্ধান্তে সমাজে শান্তি, স্থিতি ও সাম্য প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে অশান্তি, অস্থিরতা ও ভেদভাব সৃষ্টি হয়ে গেল। সমাজের মানুষের মধ্যে প্রশ্ন উঠছে, কেন বার বার হিন্দুদের শ্রদ্ধার কেন্দ্রগুলিই আক্রমণের লক্ষ্য হচ্ছে? এই পরিস্থিতি সমাজ জীবনে শান্তি ও স্বস্তির পক্ষে ক্ষতিকারক।

একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্য 'স্ব' উৎসারিত ব্যবস্থা

ভারতের জাতীয় জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে পুনরুত্থানের জন্য সমস্ত পদক্ষেপ শাশ্বত মূল্যবোধের চিরন্তন ভিত্তির সঙ্গে সম্পর্কিত হতে হবে। আমাদের দেশের মধ্যেই যা কিছু আছে তা স্থান-কাল পাত্র অনুসারে সংশোধন করে নিতে হবে এবং প্রয়োজন হলে কিছু অংশ সম্পূর্ণ বাদ দিয়েও সময়োপযোগী করে নিতে হবে। সেই সঙ্গে পৃথিবীতে যা কিছু মহান ও কল্যাণকর সেগুলিকেও দেশের প্রয়োজন অনুসারে গ্রহণ করতে হবে। এই দুই সিদ্ধান্ত একই তাত্ত্বিক ভিত্তি অনুসারে নিতে হবে। এটাই আমাদের দেশের প্রকৃতি। এটাই হিন্দুত্ব। নিজের সংস্কৃতি ও প্রকৃতির প্রতি পূর্ণ আস্থা রেখেই কোনও দেশ বড়ো হতে পারে— অন্ধ অনুকরণ করে নয়।

প্রশাসনিক সংবেদনশীলতা, স্বচ্ছতা, তৎপরতা ও সম্পূর্ণতা যা জনকল্যাণমূলক প্রকল্প রূপায়ণের জন্য প্রয়োজন, তা এখনো আশানুরূপ নয়। ফলস্বরূপ ওই সমস্ত জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের সুফল সমাজের পিছিয়ে পড়া অন্তিম সারির মানুষের কাছে পৌঁছচ্ছে না। ব্রিটিশ শাসন আমাদের দেশে কেবলমাত্র ক্ষমতা ধরে রাখার কাজ করেছিল। স্বাধীন ভারতে আমাদের শাসকরা প্রশাসনকে জনকল্যাণমুখী করে তুলবেন — এই আশা থাকবে।

রাজনৈতিক স্বাধীনতা কখনোই আপনা আপনি সম্পূর্ণ হতে পারে না। রাষ্ট্রজীবনের সমস্ত ক্ষেত্র 'স্ব' এবং স্বগৌরবের ভিত্তিতে স্বীকৃত হতে হবে যেমনভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় আমরা 'আমরা ভারতীয়' এই বোধ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম। স্বাধীন ভারতের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা সংবিধানের চারটি অংশে প্রতিফলিত হয়েছে, সেগুলি হলো— প্রস্তাবনা, মৌলিক অধিকার, নির্দেশক নীতি এবং মৌলিক কর্তব্য। এগুলির ভিত্তিতেই আমাদের দেশের উন্নয়নের নিজস্ব রূপরেখা নির্মাণ করতে হবে। আমাদের লক্ষ্য, দিশা এবং তদনুযায়ী জাতীয় জীবনের বিভিন্ন দিক, যেমন অর্থনীতি, সমস্ত কিছু

এই ভাবনা দ্বারা চালিত হওয়া উচিত। কেবলমাত্র আমাদের সমস্ত নীতি ও প্রয়াস সম্পূর্ণ ও সফলভাবে রূপায়িত হবে।

বিশ্বের সমস্ত দেশ থেকে মহান নীতি সমূহ যা আমাদের অগ্রগতির জন্য অপরিহার্য তা গ্রহণ করে আমাদের নিজস্ব দার্শনিক ভিত্তিতে একটি বিশিষ্ট রূপরেখা নির্মাণ করা প্রয়োজন।

শ্রীরামজন্মভূমি

রাষ্ট্রহিতের জন্য 'স্ব'-এর গৌরবে গৌরবান্বিত কোটি কোটি দেশবাসীর সঙ্গে সঙ্ঘও শ্রীরামজন্মভূমিতে মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্রের ভব্য মন্দির নির্মাণের মহৎ কার্যে সহযোগীর ভূমিকা পালন করছে। যদিও সমস্ত রকম সাক্ষ্য প্রমাণে এই সত্য প্রতিষ্ঠিত যে, ওই স্থানে কোনও এক সময় শ্রীরামমন্দির ছিল, তবু জন্মভূমিস্থলে এখনো মন্দির নির্মাণের জন্য হস্তান্তরিত করা হয়নি। এটা স্পষ্ট যে কতিপয় স্বার্থান্বেষী শক্তি নতুন নতুন প্রসঙ্গ উত্থাপন করে, আইনি জটিলতা সৃষ্টি করে চূড়ান্ত রায়দানকে বিলম্বিত করছে। কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়াই যেভাবে সমাজকে ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হচ্ছে তাতে কারোই ভালো হচ্ছে না। দেশের আত্মমর্যাদার প্রশ্নে মন্দির নির্মাণ আবশ্যিক। মন্দির নির্মিত হলে দেশে সদ্‌ভাবনা ও ঐক্যের পরিবেশ তৈরি হবে। কিন্তু রাষ্ট্রহিতের সঙ্গে যুক্ত এই কার্য রূপায়ণে কিছু মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক শক্তি লাগাতার বাধাদানের চেষ্টা করে চলেছে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য। সমস্ত রকম ছলচাতুরি সত্ত্বেও ওই ভূখণ্ড সম্পর্কে শীঘ্র সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত এবং উপযুক্ত ও প্রয়োজনীয় আইন তৈরি করে সরকারের উচিত ভব্য মন্দির নির্মাণে সমস্ত বাধা দূর করা।

নির্বাচন

দেশের নেতৃত্ব কে দেবে? যে নীতিতে দেশ চলছে তা ঠিক না ভুল? এই সব প্রশ্নের সমাধান যে কোনও গণতান্ত্রিক দেশের মানুষ পাঁচ বছর অন্তর একবার খোঁজে। এটা নাগরিকদের কর্তব্য হিসেবে বিবেচিত হয়। এভাবেই আমরা ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষ নিজেদের অধিকার প্রয়োগ করে রাষ্ট্রব্যবস্থায় নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করি। কিন্তু আমরা এও জানি যে, একটি নির্দিষ্ট দিনে আমরা যে সিদ্ধান্ত নিই তার ভালো বা খারাপ ফল আমাদের জীবনে স্বল্পমেয়াদি বা দীর্ঘমেয়াদি কিংবা জীবনব্যাপী প্রভাব ফেলে। পরে যেন আফশোষ করতে না হয় তার জন্য ব্যক্তিস্বার্থ, অহমিকা, জাত-পাত, ভাষা, আঞ্চলিকতা সব কিছুর উর্ধ্বে উঠে ভোটদানের সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কোনওভাবে মোহগ্রস্ত বা আবেগতাড়িত না হয়ে প্রার্থীর সামর্থ্য ও আন্তরিকতা, রাষ্ট্রের প্রতি দায়বদ্ধতা, পূর্বের ও বর্তমানের কাজকর্মের অভিজ্ঞতা ইত্যাদি সবকিছু ভোটদাতাদের বিচার করতে হবে।

গণতান্ত্রিক কাঠামোর বৈশিষ্ট্যই এমন যে, কোনও ব্যক্তি বা দলকেই সম্পূর্ণ ঠিক বা ভুল হিসেবে গণ্য করা যায় না। এই পরিস্থিতিতে 'কাউকেই ভোট নয়'(নোটা) কার্যত সবথেকে অনুপযুক্ত প্রার্থীর পক্ষেই যায়। সেজন্য সব পক্ষের প্রচার ও বক্তব্য দেখেশুনে কোনও ফাঁদে পা না দিয়ে একশো শতাংশ ভোটদান দেশের স্বার্থেই অপরিহার্য। ভারতের নির্বাচন কমিশনও নিজের বিবেক অনুযায়ী একশো শতাংশ ভোটদানের আবেদন করে থাকে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা নাগরিক হিসেবে ভোটদানকে আবশ্যিক কর্তব্য হিসেবে গণ্য করে এবং এবারেও তা করবে।

প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই সঙ্ঘ দলীয় রাজনীতি এবং জাত-পাত দ্বারা চালিত রাজনীতি থেকে দূরে থেকেছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। দেশব্যাপী ছড়িয়ে থাকা স্বয়ংসেবকরা তাদের নাগরিক কর্তব্য পালন করবে এবং রাষ্ট্রহিতের জন্য সর্বশক্তি দিয়ে কাজ করবে। দেশের স্বার্থে এটি অত্যন্ত জরুরি।

আহ্বান

রাষ্ট্রহিতের জন্য অনিবার্য প্রয়োজন হলো ভারতের 'স্ব' পরিচয়ের স্পষ্ট অধিষ্ঠানের ওপর প্রতিষ্ঠিত সামর্থ্যসম্পন্ন ও গুণসম্পন্ন সংগঠিত সমাজ এই দেশে তৈরি করা। আমাদের হিন্দু পরিচিতি সকলকে সম্মান, সকলকে স্বীকার করে নেওয়া, সকলের সঙ্গে আত্মীয়তা এবং সকলের কল্যাণ করার শিক্ষা দেয়। সঙ্ঘ একটি সংগঠিত, শক্তিশালী হিন্দু সমাজ নির্মাণ করতে চায় এবং এই লক্ষ্য পূরণের জন্য কাজ করে চলেছে। সমাজের সেই সব মানুষ যারা ধর্ম, রীতি, জীবন যাপনের জন্য পদ্ধতির জন্য নিজেদের বিচ্ছিন্ন ভাবে কিংবা হিন্দু শব্দটিতেই ভয় পায় তাদের বোঝা উচিত যে, হিন্দুত্ব হলো এ দেশের সনাতন মূল্যবোধ। এই চিরন্তন সত্যকে বজায় রেখেই স্থান-কাল অনুসারে পরিবর্তন ঘটেছে এবং ভবিষ্যতে ঘটবে। আসমুদ্র হিমালয় ভারতবর্ষের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত হিন্দুত্ব। সঙ্ঘ চায় সেই শাশ্বত ভারতীয় সংস্কৃতির ধারায় সকলে অনুপ্রাণিত হোক। ভারতবর্ষের মত-পথ-সম্প্রদায় একই সাংস্কৃতিক ভাবনা দ্বারা চালিত হওয়া উচিত। এই হিন্দু সংস্কৃতি ও সমাজকে সুরক্ষিত ও সমুন্নত রাখার জন্য আমাদের পূর্বপুরুষরা আত্মত্যাগ করেছেন,তাঁরা আমাদের গৌরব। হিন্দুত্বের কারণেই ভারতবর্ষ সারা বিশ্বকে আত্মীয়তায় বরণ করেছে, সমস্ত বৈচিত্র্যকে প্রশংসা ও গ্রহণ করেছে। এজন্যই ভারত হিন্দুরাষ্ট্র। কেবলমাত্র সংগঠিত হিন্দু সমাজই দেশের অখণ্ডতা, একাত্মতা ও নিরন্তর উন্নতির ভিত্তিস্বরূপ। সমগ্র বিশ্বে উগ্রপন্থী, সংকুচিত স্বার্থান্বেষী ও অত্যন্ত জড়বাদিতার জন্য মর্যাদাহীন ভোগপ্রবৃত্তি এবং সংবেদনহীনতাকে সমাপ্ত করার একমাত্র উপায় হলো হিন্দুত্বের শাশ্বত মূল্যবোধকে গ্রহণ করা। এজন্যই হিন্দু সংগঠনের কাজ বিশ্বহিতৈষী, ভারত কল্যাণকারী এবং লোক কল্যাণকারী কাজ।

আপনাদের সকলকে আহ্বান জানাই--- আসুন, সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের এই পবিত্র ঈশ্বরীয় কার্যে সহযোগী ও সহভাগী হয়ে আমরা সবাই মিলে ভারতমাতাকে বিশ্বগুরুর আসনে স্থাপন করার জন্য ভারতের ভাগ্যরথকে এগিয়ে নিয়ে যাই।

এখন আর সময় নেই গভীর নিদ্রামগ্ন হয়ে শুয়ে থাকার
মতভেদে ভুলে থাকা নয়, সময় এখন এক হওয়ার।
রাষ্ট্রশক্তি বাড়বে যাতে তাই আমাদের করতে হবে
স্বয়ং জাগ্রত হয়ে দেশকে আমাদের জাগাতে হবে।

।। ভারতমাতা কী জয়।।

(নাগপুরে বিজয়াদশমী উৎসবে সরসঙ্ঘচালকজীর ভাষণ)

Harry & Co. Trading (Kolhapur) Pvt. Ltd.

Phone : 2235-3641, 2235-6483

54, Ezra Street, Block D-2
1st Floor
Kolkata - 700 001

With Best Compliments From :-

Shree Enterprises (Coal Sales) Pvt. Ltd.

Coal Merchants & Commission Agents

32, Ezra Street, Room No. 854,
Kolkata - 700 001
Phone (O) 2235-0277, 9934

SUPERSPEED CARRIERS PRIVATE LIMITED

2 Roopchand Roy Street, 3rd Floor, Room No. 309, Kolkata - 700 007
Phone : 32476907, Telefax : 2270 1163, Mobile : 98302 76002 E-mail : superspeed@dataone.in

শুভ দীপাবলীর শুভেচ্ছা সহ—

উমেশ গোয়েঙ্কা

নিয়ামতপুর, পো ঃ সীতারামপুর, জেলা - বর্ধমান

পূজা ও দীপাবলীর অভিনন্দন গ্রহণ করুন —

Shree Nursing Electric Stores

A thoughtful and caring act by you can make the journey more comfortable

Follow these basic rules

- Do not carry your backpack on your shoulders. Carry it in front of you.
- Do not occupy a seat earmarked for Senior Citizens.
- Please allow commuters to get down first and then board the train.
- Do not rush in when the doors are closing.

Be a part of the large, loving and caring Metro family.

Metro Railway
Kolkata's Pride

Please follow us at /metrorailwaykol /metrorailkolkata

ABC

সা প্তা হি ক রা শি ফ ল

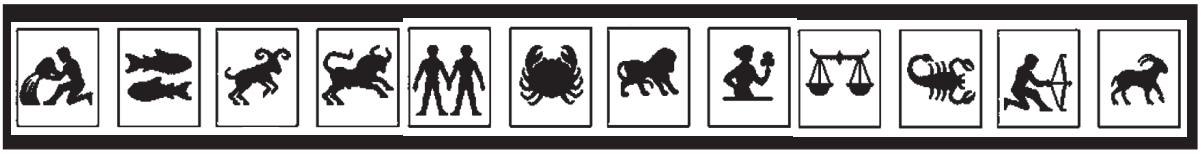

৫ নভেম্বর (সোমবার) থেকে ১১ নভেম্বর (রবিবার) ২০১৮। সপ্তাহের প্রারম্ভে কর্কটে রাহু, তুলায় রবি বক্রী শুক্র, বৃশ্চিকে বুধ-বৃহস্পতি, ধনুতে শনি, মকরে মঙ্গল। মঙ্গলবার সকাল ৭-৫৫ মিনিটে মঙ্গলের কুম্ভে প্রবেশ। রাশি নক্ষত্র পরিক্রমায় চন্দ্র কন্যায় হস্তা থেকে ধনুতে মূলা নক্ষত্রে।

মেষ : রহস্যজনক কাজে প্রবণতা বৃদ্ধি। আত্মীয় বৎসলতা ও আধ্যাত্মিক কর্মে মনোনিবেশ। বিলাসদ্রব্যের প্রীতি আকর্ষণী মনোভাব। কুলশ্রেষ্ঠর স্বীকৃতি হাতছাড়া। সপ্তাহের শেষভাগে মনে উদ্দীপনা ও ভাগ্যাকাশে নব সূর্যোদয়ের সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীর মনঃসংযোগের অভাব। গৃহে চোরের আগমন। দাঁত ও পেটের গণ্ডগোল দেখা দিতে পারে।

বৃষ : কবি, সাহিত্যিক-বাগ্মী শিল্পীদের চিন্তার স্বচ্ছতা, জ্ঞানের প্রসার ও অভীষ্ট সিদ্ধি লাভ। আমদানি-রপ্তানি ও যানবাহন ব্যবসায় লাভবান। দাম্পত্য জীবন সুখকর। বিদেশ যাত্রায় রোমান্টিকতা। লাইফ পার্টনারের দূরদর্শিতা, সন্তানের উচ্চশিক্ষা, ভ্রাতা-ভগ্নির জীবনের ঝরাপাতায় বসন্তের ন্যায় বর্ণময় জীবনের সূচনা। পারিবারিক সহনশীলতা ও মায়ের স্বাস্থ্য সচেতনতা দরকার।

মিথুন : পারিবারিক সৌহার্দ্য ও প্রতিবেশীর সঙ্গে বুদ্ধিমত্তায় সুসম্পর্ক বজায় রাখুন। এ সপ্তাহে অযাচিত অর্থ ব্যয় ও কর্মক্ষেত্রে কাজের চাপ বৃদ্ধি। বিনিয়োগে আর্থিক লাভ ও অগ্রজের উন্নতি যোগ। কর্মপ্রার্থীদের কর্মলাভ ও প্রেমের পূর্ণতা প্রাপ্তি। দান-ধ্যান সমাজসেবা মূলক কাজ ও বিজাতীয় সংস্পর্শে আনন্দঘন পরিবেশ।

কর্কট : প্রতিবেশীর সহযোগিতা অক্ষুণ্ণ থাকলেও জমি, বাড়ি বিষয়ক অস্বস্তির যোগ। শরীরের মধ্যভাগের শল্যচিকিৎসার প্রয়োজন হবে। অফিসের কাজে ট্রেনিং ও হঠাৎ অর্থপ্রাপ্তির যোগ। অসৎ ব্যক্তি থেকে দূরত্ব, অন্যথায় উদারতার সুযোগে প্রতারণার সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীর বুদ্ধি ও প্রতিভার বিকাশে তমসা আধারে আলোকবর্তিকা।

সিংহ : এ সপ্তাহে বুদ্ধি, মেধা, দৃঢ়তা, উদারতা, সৌন্দর্য সুধা প্রাপ্তির ঐশ্বর্য। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা অথবা কর্মসূত্রে প্রবাস। মাতুলের অসুস্থতায় অস্বস্তি, তবে ভালো কাজে ভালো বন্ধুর সান্নিধ্য লাভ, আর্থিক শুভ।

কন্যা : পারিবারিক পরিবেশ তথা গৃহসুখ বিঘ্নিত হবে। আত্মীয় বৎসলতা ও শরীরের ঊর্ধ্বাঙ্গের চিকিৎসায় ব্যয়। প্রতিপক্ষের বিরূপতা, বাকপটুতা ও অমিতব্যয়িতায় ব্যথিত বোধ। মননশীল মিষ্টি স্বভাবের প্রকাশ, দেব-দ্বিজে ভক্তি। আবেগের বশে বিরোধিতায় সম্মান হানি। জল ও আগুনে ভয়।

তুলা : স্নেহপ্রবণ মন সুন্দরের পূজারি, রসিক, নির্ভীক, স্বাধীনচেতা প্রবাস ব্যবসায় শ্রীবৃদ্ধি, গৃহের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি। প্রণয়ী থেকে পত্নী রূপের প্রকাশ। নতুন বিনিয়োগে মানসিক প্রশান্তি, দীর্ঘদিনের কাঙ্ক্ষিত মনোবাঞ্ছা পূরণ। মিত্র ও সন্তান হিতকারী ও আনন্দদায়ক।

বৃশ্চিক : এ সপ্তাহটা ভালো-মন্দ মিশ্রফল যোগ। মাতুলের সঙ্গে সম্পর্ক ও পিতার স্বাস্থ্য বিষয়ে উদ্বেগ ও অস্বস্তি। একাধিক অর্থাগমের সম্ভাবনা। কর্মপ্রার্থীদের কর্মলাভ। সন্তানের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি ঘটলেও সপ্তাহের শেষভাগে শোক-দুঃখ, বেদনায় ভারাক্রান্ত মন। শারীরিক ও মানসিক ক্লেশ।

ধনু : আর্থিক অনটন ও স্ত্রীর চিকিৎসায় মানসিক উদ্বেগ। পেশাদারদের খ্যাতি-প্রতিযোগিতায় সাফল্য। কর্মক্ষেত্রে যশ ও শংসা, লিখিত কর্মে যুক্তদের প্রতিভার বহুমুখী প্রকাশ ও ধনার্জন ক্ষমতা বৃদ্ধি। স্বজন সমাগম, সন্তানের খেলাধূলায় দৃঢ় প্রত্যয়।

মকর : শরীরের যত্নের প্রয়োজন। পৈতৃক সম্পত্তি ও দালালি ব্যবসায় প্রাপ্তির ক্ষেত্রে শুভ। স্বীয় প্রতিভায় যশ-সম্মান। ভ্রমণে সাফল্য। কর্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানগত বদলি ও পদোন্নতি। সৃজনশীলতা, ধর্ম, কর্মে উদার ও অনুভবী। নীতিগত বিষয়ে সমঝোতা শ্রেয়। আইনি জটিলতা পরিহার করুন।

কুম্ভ : স্ত্রীর স্বাস্থ্য ভালো না গেলেও সন্তানের উচ্চশিক্ষা ও কর্মলাভের উজ্জ্বল সম্ভাবনা। বহুদিনের অবরুদ্ধ কাজের সুরাহা। সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজে পরিকল্পনায় নিপুণতা। আর্থিক শুভ, সাধনায় দীপ্তি।

মীন : স্বীয় প্রতিভায় উপার্জনের পথের বাধা অপসারিত হবে। বিদেশ গমন। গণিতজ্ঞ, বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ, আইনজ্ঞের সুন্দর শাস্ত্রীয় জ্ঞান ও কারিগরী দক্ষতা। ধনার্জনে ক্ষমতা বৃদ্ধি। পার্থিব সুখ, বিত্ত ও অভিজাত্য গৌরবে সপ্তাহ অতিবাহিত হবে।

• *জন্ম ছকের স্বাতন্ত্র্য ও দশা-অন্তর্দশা না জানায় কেবল গোচর ফল বর্ণিত হলো।*

—শ্রী আচার্য্য